॥ এক ॥

অটোয়া থেকে সুধন্য চিঠি লিখেছে।

আমার বাল্যবন্ধু সুধন্য। এখন কানাডার নাগরিক।

সুধন্য লিখেছে—'আমি নরদার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে ফেডারেল সরকারের রাজস্ব বিভাগে নতুন চাকরি নিয়েছি। না, না, এবারে ঝগড়া করে চাকরি ছাড়ি নি। ঝগড়া করার আর দরকার হবে বলেও মনে হচ্ছে না। কারণ এদেশে সৎ থেকেও চাকরি করা যায়।'

'সরকারী চাকরি পেলে এখানে কেউ হাতছাড়া করেন না। কারণ এদেশে সরকারী চাকরিতে যেমন সম্মান, তেমনি ভাল মাইনে—তার ওপরে নানা রকমের সুযোগ-সুবিধে। আমি একটা চমৎকার কোয়ার্টার ও বিরাট একখানা গাড়ি পেয়েছি। কাজেই বলতে পারিস, আমরা এখন সুখে ও শান্তিতে সংসার করছি।...'

করুক, সুধন্য ও বীথিকা সুখে সংসার করুক। তারা শান্তিতে থাকুক। দেশের মায়ায় দেশে ফিরে এসে সুধন্য সাতটা বছর বড়ই-অশান্তিতে কাটিয়ে গেছে। কানাডায় গিয়ে সে এক বছরেই শান্তির সন্ধান পেয়েছে। সুধন্য ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স-এর এ. সি. এ. মানে এসোসিয়েটেড্ চার্টারড্ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। স্বভাবতই কানাডায় তার সমাদর হয়েছে।

যাক্ গে, চিঠিটা পড়া যাক্। সুধন্য লিখেছে—'অটোয়া দক্ষিণ-পূর্ব কানাডার একটি ছোট শহর। চারদিক নদী দিয়ে ঘেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভারী সুন্দর ঝকঝকে শহর।'...

'ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে দুর্গাপুজো এসে গেল। তুই বোধহয় এখন পুজো-সংখ্যার লেখা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছিস।

তাহলেও একটু সময় করে তাড়াতাড়ি উত্তর দিস। তোদের চিঠি এলে বড় ভাল লাগে। তোদের চিঠিতে আমি ছেড়ে-আসা জন্মভূমির মধুর স্পর্শ লাভ করি। ছেড়ে এলেও আমি তাকে আজও ভালোবাসি, চিরকাল বাসব।…'

সুধন্য রিপ্যাট্রিয়েট-ভিসা নিয়ে কানাডায় চলে গেছে। অর্থাৎ এক কথায় তাকে এ দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। তবু সে নাকি আজও দেশকে ভালোবাসে এবং চিরকাল বাসবে! আশ্চর্য!

চিঠিটা পড়া যাক্। সুধন্য লিখেছে—'আমাদের মেয়েটি এখন হাঁটতে শিখছে। সে একটু একটু কথা বলে। আমরা তাকে বাংলা শেখাবো ঠিক করেছি। বাংলার মতো এমন ক্লান্তি-নাশা ভাষা যে আর কোথাও নেই।'

'বীথি তার নাম রেখেছে পিয়া, আর আমি ডাকি ভারতী। দু' নামেই সে সমান সাড়া দেয়। ভারতী আমাদের দু'জনের সবটুকু অবসর ভরে রাখে।…'

চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। সামনে ছোট এক টুকরো বাগান আর দূরে একফালি শরতের আকাশ। নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা আর সবুজ বাগানে নানা রঙের আলপনা। গোলাপ ও রজনীগন্ধা, দোপাটি ও শেফালিকা, জুঁই ও জবা, আরও অনেকে—ওরা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। জিজ্ঞেস করছে—তুমি স্মৃতির সাগরে ডুব দিতে চাইছ? বেশ তো, ভাল করে আমাদের দিকে তাকাও, তোমার সব কথা মনে পড়ে যাবে। সুধন্য যে আমাদের বড়ই ভালোবাসে।

ঠিকই বলছে ওরা। সুধন্য ফুল বড় ভালোবাসে। শুধু ফুল কেন, এদেশের ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস, মাটি ও মানুষ—সব কিছুর ওপরেই ওর একটা আশ্চর্য আকর্ষণ। আর তাই তো বিলেতের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে দেশে ফিরে এসেছিল।

পারল না। এদেশে টিঁকতে পারল না সুধন্য। দেশের মাটি আর মানুষকে এত ভালোবেসেও তাকে দেশছাড়া হতে হোল।

জন্মভূমির নাগরিকত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে সুধন্যকে। দেশের মানুষ কিন্তু এজন্য মোটেই দুঃখিত হয় নি, বরং অনেকে আনন্দিত হয়েছে। সেদিন সেই কথাই বলছিল সুধন্য, চলে যাবার কয়েকদিন আগে। সে তখন পাসপোর্ট অফিসে ছুটোছুটি করছে। একদিন দুঃখ করে বলল, "জানিস, আমি যখন অফিসারদের সঙ্গে দেখা করি, তখন তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়—আমি যেন একজন অপরাধী, তাই তাঁরা আমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

"অপরাধী বৈকি।" আমি বলেছি, "স্বাধীনতা পাবার পরেই তুই বিলেতে চলে গিয়েছিলি। জানতে পারিস নি, এ দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসা এখন অন্যায়। অজ্ঞনতা একটা অপরাধ তো বটেই।"

সুধন্য হেসেছে, করুণ হাসি। তারপর বলেছে, "সত্যি ভাই, আমি জানতাম না যে এদেশে বাস করতে হলে প্রথম ভালোবাসতে হবে নিজেকে, তারপরে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে। আর সবার শেষে সম্ভব হলে দেশকে।"

"অথচ আমার এটা অনুমান করা উচিত ছিল। কারণ আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ যে একটি দেশ, এ ধারণা আমাদের মনে প্রথম জন্মেছে ইংরেজ আমলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ কোন কালেই একটি অখণ্ড দেশ ছিল না। ভারতবর্ষের প্রতি ভারতবাসীর দেশপ্রেম ইংরেজ আমলের অবদান। অর্থাৎ এদেশে দেশপ্রেম একটি বিদেশী পণ্য। ইংরেজরা চলে যাবার পরেই তোদের বৈদেশিক-মুদ্রা তহবিলে ঘাটতি চলেছে। সুতরাং তোরা দেশপ্রেমের মতো বাজে জিনিস আমদানী করে বৈদেশিক-মুদ্রার অপচয় করবি কেন? তার চেয়ে ঘুষ, কালোটাকা ও স্বজনতোষণ প্রভৃতি দিশী জিনিস দিয়ে বাজার ভরে রাখ। আর একান্তই যদি কোন বহিরাক্রমণ ঘটে, তখন না হয় রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দেশে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিবি।"

ওর কথা শুনে যেমন হাসি পেয়েছে, তেমনি দুঃখও পেয়েছি। তাই জিজ্ঞেস করেছি, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেও তো এদেশে বহু দেশপ্রেমিক জন্মেছেন?"

"না। তাঁরা কেউ অখণ্ড ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন নি। ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রতি ভালোবাসাই তাঁদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে। এদেশের প্রথম দেশপ্রেমিক সিপাহী-বিদ্রোহের শহীদরা।"

"ঘুষ, কালোটাকা ও স্বজনতোষণকে দিশী জিনিস বলছিস কেন?" আমি প্রশ্ন করেছি।

সুধন্য উত্তর দিয়েছে, "কারণ এগুলি চিরকালই এদেশে ছিল। এখন হয়তো স্বরূপ পালটেছে। সেকালের ঠগীদস্যুর সঙ্গে একালের আড়তদারের কোন পার্থক্য আছে কি? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এদেশে মাৎস্যন্যায়ের অবাধ রাজত্ব ছিল। ইংরেজ চলে যাবার পরে আবার সেই মাৎস্যন্যায় শুরু হয়েছে।"

সুতরাং সুধন্যকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হোল। অথবা আমরাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। ঠিকই করেছি। সুধন্য যে কিছুতেই তার ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিতে রাজী হোল না। আর সেই সৎ জীবন যাপন করার জিদই তাকে দেশ-ছাড়া করল। অর্থাৎ এদেশের নাগরিক হবার যোগ্যতাই নেই তার।

যোগ্যতা নষ্ট হবার প্রধান কারণ সে স্বাধীন ভারতে বসেও পরাধীন ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিকদের কথা ভাবত। আট বছর বিলেতে থেকে সে যতটা মদ খাওয়া ও মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো শিখেছিল, তার চাইতে অনেক বেশি শিখেছিল স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার নিয়ম-কানুনগুলো। সেগুলো নিজের দেশে কাজে লাগাবে বলেই নাকি সে চাকরি পাওয়া মাত্র কলকাতায় চলে এসেছিল।

চাকরিটা কিন্তু খুবই ভাল ছিল। একে তো বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানী, তার ওপর তিন হাজার টাকা মাইনে। ওয়েল-

ফার্নিশ্‌ড্‌ কোয়ার্টার, বড় গাড়ি, সুন্দরী স্টেনোগ্রাফার—সবই পেয়েছিল সে।

কিন্তু সুধন্যটা একেবারেই অপদার্থ। রাখতে পারল না কিছুই। তবে সেকথার আগে আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ছে আমার।

বিলেত থেকে এসে সুধন্য তখন সবে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। একদিন সন্ধ্যার সময় সহসা শশাঙ্ক এসে হাজির হোল আমার বাড়িতে। শশাঙ্ক আমাদের বাল্যবন্ধু, কিন্তু বহুবছর তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। কাজেই তার আকস্মিক আগমনে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলাম।

যাই হোক, মামুলি কথাবার্তার পরে শশাঙ্ক সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, আমাদের সহপাঠী সুধন্যর সঙ্গে তোর কোন যোগাযোগ আছে?"

হেসে বললাম, "আছে বৈকি সে যে তোদের কোম্পানীতে চাকরি পেয়েই বিলেত থেকে ফিরে এসেছে।"

"তাহলে আমার ভুল হয় নি ঠিকই চিনেছি।" শশাঙ্ক যেন একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল। বলল, "জানিস, সুধন্য এখন আমার বড়সাহেব।"

"ভালই হোল, তোর সুবিধে হবে।"

"না রে ভাই, ভীষণ স্ট্রিক্‌ট্‌ অফিসার, চিনতেই চান না। আমার কিন্তু প্রথমদিন থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, তবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। কেমন করে করি বল্‌?" একটু থামল শশাঙ্ক। তারপর বলে উঠল, "যে চেয়ারে এতকাল বিলেতী সাহেবরা বসেছেন, সেই চেয়ারে প্রথম ভারতীয় হবে আমাদের সুধন্য! একথা কি বিশ্বাস করা যায়?"

"কেন যাবে না?" আমি বলেছি, "এক জায়গা থেকে জীবন আরম্ভ করেছি বলে, একই জায়গায় পৌঁছে সবাইকে থেমে থাকতে হবে, তেমন তো কোন কথা নেই। সুধন্য কষ্ট করে বিলেত

গেছে, কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে। আজ সে বড় চাকরি করবে, এর মধ্যে অবিশ্বাসের কি আছে?”

কিছুক্ষণ গল্পের পরে শশাঙ্ক সেদিন বিদায় নিয়েছিল। আর আমি পরদিন অফিসে গিয়েই সুধন্যকে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম শশাঙ্কর কথা। সব শুনে সে বলল, “আমারও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু নিশ্চিত না জেনে কোন প্রশ্ন করা অফিস এটিকেটের বাইরে বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারি নি। যাক গে, আমি ওর সঙ্গে আলাপ করব'খন।”

আলাপ করেছিল সুধন্য। আর সে আলাপের গল্প শশাঙ্ক এক দিন বলেছে আমাকে।

সেদিন শশাঙ্ক একটা ফাইল নিয়ে গিয়েছিল সুধন্যর চেম্বারে। কাজ শেষ হবার পরে সুধন্য তাকে বলল, “মিঃ দাস, আজ অফিস-আওয়ারের পরে আপনার কয়েক মিনিট সময় হবে?”

“কেন হবে না স্যার! বলুন কি করতে হবে?”

“না না, কোন কাজ নয়। আপনার সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত দরকার আছে। আপনি অফিসের পরে দয়া করে একবার আমার চেম্বারে আসবেন।”

বলা বাহুল্য, সেদিন সিটে ফিরে গিয়ে শশাঙ্ক আর কোন কাজে মন বসাতে পারে নি, কেবল ঘড়ি দেখেছে। এক সময় পাঁচটা বেজেছে। কাগজপত্র গুছিয়ে সে সহকর্মীদের নিষ্ক্রমণের প্রতীক্ষা করেছে। তারপরে এসে ঢুকেছে সুধন্যর চেম্বারে।

সুধন্য তাকে বলেছে, “দয়া করে বাইরে গিয়ে বেয়ারাকে চলে যেতে বলুন। বলে দিন, আমার দেরি হবে। আর আপনি একেবারে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবেন।”

নির্দেশ পালন করে শশাঙ্ক ফিরে এসেছে টেবিলের সামনে। সবিস্ময়ে শুনেছে সুধন্য তাকে বলছে, “কিরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্।”

বিস্মিত শশাঙ্ক তার বড়সাহবের দিকে তাকিয়েছে।

সঙ্গে যখন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, তখন সে আবার বিলেতেই চলে যাক্ না। সেখানে নিশ্চয়ই ওর কদর হবে।

সেই কথাই সেদিন আমি বলেছিলাম সুধন্যকে। কিন্তু সে একটু হেসে জবাব দিয়েছিল, "চলে যাব বলে তো চলে আসি নি ভাই, চিরকাল থাকব বলেই দেশে ফিরে এসেছি। চাকরি করা হোল না। না হোক্, ব্যবসা করব।"

"ব্যবসা!" আমি আঁতকে উঠেছি।

"হ্যাঁ।" সুধন্য আবার একটু হেসেছে। বলেছে, "আমি প্র্যাক্‌টিশ করব, অডিট ফার্ম খুলব। পোলক স্ট্রীটে একখানা ঘর নিয়েছি। তুই সেদিন বলেছিলি না, আমাদের ইনষ্টিটিউটের সেণ্ট্রাল কমিটির মেম্বার মিষ্টার মুখার্জীর সঙ্গে তোর পরিচয় আছে। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে, নতুন ফার্ম খোলার ফর্ম্যালিটিজগুলো জেনে নিতে চাই।"

সেদিন সুধন্যকে আমি বাধা দিই নি। কারণ, তাতে কোন লাভ হত না। ছোটবেলা থেকেই সে যেমন আদর্শনিষ্ঠ, তেমনি একরোখা।

তাই সুধন্যকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম মিঃ মুখার্জীর কাছে। সব শুনে তিনি কিন্তু সুধন্যকে সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবার পরামর্শই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মিঃ রায়, আপনার যা আইডিয়া, তাতে আমি আপনাকে নতুন ফার্ম খুলতে এন্‌কারেজ করতে পারছি না। এমনিতেই বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। তার ওপরে আপনি আবার বলছেন ট্যাক্সের কাজ করবেন না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সুধন্য সবিনয়ে বলেছে, "আমার ধারণা ট্যাক্স ডীল করলেই আমাকে ডিসঅনেষ্ট হয়ে যেতে হবে। আই ওয়াণ্ট্ টু লীড্ এ্যান্ অনেষ্ট্ লাইফ।"

"প্রব্যাব্‌লি ইউ কাণ্ট ডু দ্যাট্ হিয়ার।" মিঃ মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, "মিঃ রায় সৎ থেকে এদেশে এখন

অডিট্ ফার্ম চালানো খুবই শক্ত, আর অনেষ্ট্ লাইফ লীড করা বোধহয় একবারেই অসম্ভব।"

তবু সুধন্য চেষ্টা করেছে। সৎ জীবন-যাপন করার শেষ চেষ্টা।. পারে নি। দু'বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করেও সুধন্য তার অডিট ফার্মকে দাঁড় করাতে পারে নি। কেমন করে পারবে? পঞ্চাশ টাকা ফি-য়ের জন্য পঞ্চাশ মাইল দূরে গিয়ে গ্রামের স্কুলের হিসেব পরীক্ষা করেছে, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়েও ট্যাক্সের কাজ হাতে নেয় নি। সে যে সৎ থাকতে চেয়েছিল।

সৎ হয়ে টিকে থাকতে না পারলেও সুধন্য অসৎ হয় নি। আর তা হয় নি বলেই তাকে চিরকালের জন্য এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। ভালই করেছে সুধন্য—সোনা সুরা ও সাকীর সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে।

অতীত মিলিয়ে যায়, ফিরে আসি বর্তমানে। টেবিলের দিকে তাকাই। সুধন্যর চিঠিটা তেমনি পড়ে আছে সামনে।

সেই জায়গাটাতে আবার নজর পড়ে আমার। সুধন্য লিখেছে—"···আমরা তাকে বাংলা শেখাব ঠিক করেছি। বাংলার মত এমন ক্লান্তি-নাশা ভাষা যে আর কোথাও নেই। ··"

শেখাক্, সুধন্য ও বীথিকা তাদের মেয়ে ভারতীকে যত পারে বাংলা শেখাক। শুধু সেই গানটি না শেখালেই হল—

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি,···'

বড়সাহেব ধমক লাগিয়েছে, "বন্ধ ঘরেও তোকে আবার 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলতে হবে নাকি? বোস বলছি।"

"না, মানে…।"

"কোন মানে নেই। আগে বোস, তারপরে অন্য কথা।"

অতএব শশাঙ্ক বড়সাহেবের সামনে বসে পড়েছে, যা এদেশে একটি গর্হিত অপরাধ।

সুধন্য শান্তস্বরে শুরু করেছে, "একটা কথা, অফিসের কেউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে, তুই আমার বাল্যবন্ধু। আর তুই কখনও সেই বন্ধুত্বের সুবাদে আমার কাছ থেকে কোন অফিসিয়াল ম্যাটারে কোনরকম আনডিউ এ্যাড্‌ভান্টেজ নেবার চেষ্টা করবি নে। অফিসের বাইরে আমি তোর বাল্যবন্ধু।"

সেদিন আরও অনেক কথা হয়েছিল ওদের দু'জনের। কথায় কথায় পুরনো কেরানী নতুন বড়সাহেবকে কোম্পানীর কিছু গোপন সংবাদ পরিবেশন করেছিল। বলেছিল, "য়ুরোপীয়ান ফার্ম হলেও এখন ইণ্ডিয়া লিমিটেড। তুমি……"

"তুমি নয়, বল তুই"। সুধন্য আবার শশাঙ্ককে ধমক লাগিয়েছে।

শশাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিয়ে বলেছে, "তুই যেমন এ্যাকাউণ্টস ডিভিশনের হেড হয়ে এসেছিস, তেমনি পারচেজ ও সেলস-এর হেডরাও দিশী-সাহেব। কণ্ট্রাক্টর ও এজেন্টরা তাঁদের নিয়মিত টাকা দেয়, মদ ও মেয়ে সাপ্লাই করে।…"

"মেয়ে বলিস না, মেয়েমানুষ বল।" সুধন্য বাধা দিয়েছে।

শশাঙ্ক প্রতিবাদ করেছে, "না, মেয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়ে না হলে তাঁদের মন ভরে না।"

সুধন্য কোন কথা বলে নি, সে নিঃশব্দে শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

শশাঙ্ক বলে চলেছে, "দারিদ্র্য আজ এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে কোথায় টেনে নামিয়েছে, তা এখনও তুই টের পাস নি ভাই!" একবার থেমেছে শশাঙ্ক।

কিন্তু সুধন্য কোন মন্তব্য করে নি। শশাঙ্ক আবার বলতে আরম্ভ করেছে, "অসাধু ও চরিত্রহীন অফিসারদের জন্য কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে আর কণ্ট্রাক্টর ও এজেণ্টরা বাড়তি মুনাফা লুটেছে।"

"স্ট্রেঞ্জ!" সুধন্য কথা বলেছে, "কিন্তু অফিসাররা তো ভাল মাইনে পাচ্ছেন!"

"কি আর একটা মাইনে পান?" শশাঙ্কর স্বরে কৌতুক। "সোনা সুরা ও সাকী যাদের জীবনের অবলম্বন, তাদের কাছে দু'-তিন হাজার টাকা যে কিছুই নয়। তাছাড়া বাড়ি-গাড়ি বউ-ছেলে-মেয়ে সবই তো আছে, তাদেরও যে পুষতে হবে।" একবার থেমেছে সে। তারপরে আবার বলেছে, "বহুদিন তুই দেশে ছিলি না, ইতিমধ্যে আমরা যে কোথায় নেমে এসেছি, তা জানলে হয়তো তুই আর এদেশে ফিরে আসতিস না। সুধন্য, যে দেশে ব্যবসায়ীরা খাদ্য এবং ওষুধে ভেজাল মেশায়, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রছাত্রীকে ফাঁকি দেয়, সাংবাদিকরা সত্য সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন না, সে দেশে তুই কেন ফিরে এলি?"

সুধন্য সেদিন সে প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। শুধু বলেছে, "তাই বোধ হয় ঝুনঝুনওয়ালার বিলটা তাড়াতাড়ি পাস করে দেবার জন্য পারচেজ ম্যানেজার আজ আমাকে ফোন করেছিলেন?"

শশাঙ্ক মাথা নেড়েছে।

সুধন্য সোজা হয়ে বসেছে। গম্ভীর স্বরে বলেছে, "দেখ শশাঙ্ক, আমি এমন একটা দেশে আট বছর কাটিয়ে এসেছি, যে দেশে মানুষ সুরা ও সাকীর প্রতি অনুরক্ত হয়েও কাজ করে। সে আর সিন্‌সিয়ার টু দেয়ার এমপ্লয়ার এ্যাণ্ড কান্ট্রি। আমার এ ডিভিশনের কর্মচারীদেরও তেমনি হতে হবে। আমাদের কোম্পানীর মাইনে খুবই ভাল, তবু যদি কারও তাতে না পোষায়, সে মাইনে বাড়াবার জন্য আন্দোলনে নামতে পারে, কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতে কিংবা চুরি করতে পারে না।" একবার থেমেছে

সুধন্য। তারপরে বলেছে, "তোরা যারা আমার ডিভিশনে কাজ করিস, তারা একটা কথা সব সময় মনে রাখিস, আই নো মাই ওয়ার্ক। আর আমার কাজকর্মে কারও ইণ্টারফিয়ারেন্স আমি পছন্দ করি না। কালই আমি সার্কুলার দিয়ে দেব ফিজিক্যাল স্টক্ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট ছাড়া কোন সাপ্লায়ারের বিল পাস হবে না। এবং আমি কাল নিজে গোডাউনে গিয়ে ঝুনঝুনওয়ালার মাল চেক-আপ করব। চালানের সঙ্গে না মিললে তাঁর বিল পাস হবে না।"

"জেনারেল ম্যানেজার পাস করে দিতে বললেও না?"

"না।" তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুধন্য জবাব দিয়েছে। বলেছে, "লণ্ডন থেকে স্বয়ং চেয়ারম্যান ট্রাঙ্ক-কল করলেও নয়।"

"তাহলে তুই বোধহয় বেশিদিন এখানে টিকতে পারবি না।"

"চলে যাব, কিন্তু দুর্নীতির সঙ্গে আপস করব না।"

সত্যই আপস করে নি সুধন্য।

কিন্তু শশাঙ্ক অভিজ্ঞ কেরানী, তার কথাও মিথ্যে হবার নয়। ওপরওয়ালা এবং সহযোগীদের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতের ফলে একদিন সুধন্যকে সত্যি সত্যিই চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে হোল।

অপর পক্ষ অবশ্য আপসের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। সোনা সুরা ও সাকী—সবই নৈবদ্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুধন্য তাঁদের সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, সত্য এবং ন্যায়ের আদর্শে অবিচলিত রয়েছে।

বাধ্য হয়ে প্রতিপক্ষ অন্যভাবে আঘাত হেনেছে। সাপ্লায়ার্স ও এজেণ্টদের দিয়ে বিলেতে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর কাছে মিথ্যে অভিযোগ পাঠিয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার থেকে সেক্শন্ অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেকেই অভিযোগকারীদের সমর্থন করেছেন। একঘরে সুধন্য শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

বেশিদিন বেকার বসে থাকতে হয় নি তাকে। অত বড় না হলেও, একটা বেশ ভাল কোম্পানীতেই সে চাকরি পেয়ে গেল।

কিন্তু কিছু দিন বাদে সেখানেও সেই একই সমস্যার সূত্রপাত হোল। হবেই তো, আজকের সমাজে যে সব সমস্যার মূলে একটি বস্তু—তার নাম টাকা। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও সেই পরম-বস্তুটিকে মাটি বলে অভিহিত করেছেন, তবু তার বিনিময়ে যে সোনা সুরা ও সাকী কিনতে পাওয়া যায়।

এ যুগের শিক্ষিত যুবক হয়েও সুধন্য কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতকেই জীবনের পথ বলে মেনে নিয়েছিল। তাই সে পাপের টাকার দিকে হাত বাড়ায় নি।

কিন্তু সুধন্য অডিটর—হিসেব-পরীক্ষক। তাকে দলে না নিলে কোম্পানীর টাকা সরানো সম্ভব নয়। সুতরাং সংঘাত। শেষ পর্যন্ত সুধন্যর পুনরায় পদত্যাগ।

সেই সঙ্গে তার এদেশে চাকরি করার বাসনাও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে। একে সে অত্যন্ত কাজের মানুষ, বসে থাকতে পারে না, তার ওপর ইতিমধ্যে সে বীথিকাকে বিয়ে করে ফেলেছে। বসে খেলে জমানো টাকা কতদিন? কি করবে সুধন্য? ভাবনাটা আমাদের সবাইকেও বিচলিত করে তুলেছিল।

এই সময় এক গ্রীষ্মের দুপুরে ছাতা হাতে সুধন্য সহসা আমার অফিসে এসে উপস্থিত হল। সেদিন কলকাতায় প্রচণ্ড গরম। রাস্তায় পিচ্ গলছে। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া কেউ পথে বের হয় নি।

ওর দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ হলো আমার। রোদের তাপে ফর্সা মুখখানা যেন ঝলসে গেছে। সারা গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে। একে তো এতগুলো বছর ঠাণ্ডার দেশে কাটিয়েছে, তার ওপরে এদেশে এসেও এয়ারকণ্ডিশন্ড চেম্বার ছাড়া তখন পর্যন্ত অফিস করে নি, এবং অফিসের গাড়িতে করেই যাতায়াত করেছে। আর সেদিন তাকে ট্রাম-বাসে আসতে হয়েছিল।

ভাবলাম—এত কষ্ট করার কি দরকার? এখানকার অবস্থার

॥ দুই ॥

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুবিমল একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে, "এই যে দাদা আসুন··· আসুন। কি সৌভাগ্য !···"

এতটা আশা করি নি। করা উচিতও নয়। কারণ শ্রীমান সুবিমল মিত্র এখন মিষ্টার এস. কে. মিট্রা। বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। একদা সে আমাকে দাদা বলে ডাকত, সম্মান করত। কিন্তু তারপরে গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। আমি যে কেরানী ছিলাম, আজও সেই কেরানী রয়ে গেছি। আর সুবিমল ?

সেদিনকার জুনিয়র সুপারভাইজার সুবিমল আজ ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার। সুতরাং আমার সঙ্গে তার এখন পর্বত-প্রমাণ পার্থক্য। বিশেষ করে আজ আমি তার অনুগ্রহপ্রার্থী—জনৈক বন্ধুপুত্রের চাকরির উমেদার হয়ে আমি তার দর্শনার্থী। সুতরাং এমন উষ্ণ-অভ্যর্থনা বিস্ময়কর।

তাহলেও বিস্ময় প্রকাশ করি না। বরং তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে করমর্দন করি। সে অনুরোধ করে, "বসুন দাদা।"

আমি আসন গ্রহণ করি।

সুবিমল বেল বাজায়। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "কি খাবেন বলুন, চা না কফি ?"

হেসে উত্তর দিই, "কফি পেলে কে আর চা খায় বল ?"

সে মৃদু হাসে। বেয়ারা ঘরে ঢোকে। সুবিমল আদেশ করে, "দো কাপ কফি !"

বেয়ারা বেরিয়ে যায়।

সুবিমল চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে, "তারপরে বলুন দাদা কেমন আছেন ?"

"ভালই।" উত্তর দিই।

"কি করছেন এখন ?"

একটু হেসে বলি, "কি আবার, এদেশে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানরা যা করে থাকেন, সেই আদি ও অকৃত্রিম কেরানীগিরি।"

"ক'টা প্রমোশন পেলেন ?"

"একটাও নয়।"

"সেকি !" সুবিমল সম্ভবত সবিশেষ বিস্মিত।

হবারই কথা। আজ প্রায় চৌদ্দ বছর পরে দেখা। এই চৌদ্দ বছরে সুপারভাইজার সুবিমল মিত্র ম্যানেজার এস. কে. মিট্রা হয়েছে। আর আমি যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। এমন অবস্থা আজ বোধকরি সুবিমলের কাছে অচিন্তনীয়। সুতরাং সে বিস্মিত।

ওর বিস্ময় দমন করতে চাই। বলি, "আমাদের ছোট অফিস, প্রমোশনের তেমন স্কোপ নেই।"

"প্রমোশনের স্কোপ কোথাও নিজের থেকে আসে না, স্কোপ তৈরি করে নিতে হয়।" সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

এমন উত্তর দেবার অধিকার আছে ওর। তাই সবিনয়ে বলি, "স্কোপ তৈরি করার সেই ক্ষমতাটা যে সবার থাকে না ভাই !"

"তার চাইতে বলুন দাদা, সে ঝামেলা সবাই পোহাতে চায় না।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই একটি সুদর্শন তরুণ ঘরে ঢোকে। তার হাতে 'আমূল স্প্রে'-র বড় একটা টিন।

"নমস্কার স্যার, নমস্কার…" তরুণ কর্মচারীটি সুবিমলকে নমস্কার করে।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে সুবিমল। সানন্দে বলে, "পেয়েছো তাহলে ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।"

"থ্যাঙ্ক্ ইউ।" সুবিমল তার হাত থেকে টিনটা নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দেয়।

ছেলেটি বলতে থাকে, "শীতের বেলা, থাকি সেই কোলাঘাট। তবু স্যার, ঠিক ন'টার সময় এসে লাইন দিয়েছি। বেলা একটার পর আমার টার্ন এলো স্যার। আপনার খুবই গুড্‌লাক স্যার।"

"কেন?"

"আমি স্যার লাস্ট বাট সেকেণ্ড ম্যান। আর পনেরো মিনিট পরে গেলেই আর পেতাম না।"

"আই-সি। থ্যাঙ্ক্ ইউ ভেরী মাচ। আচ্ছা, এবারে গিয়ে জায়গায় বসো।"

"স্যার!"

"কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"কি?"

"আজ্ঞে স্যার, ছোটসাহেব আমার এ্যাটেন্‌ড্যান্সয়ে ক্রস্ দিয়ে দিয়েছেন।..."

"হোয়াট!" সুবিমল প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

ছেলেটা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, "আজ্ঞে স্যার, ছোটসাহেবের কোন দোষ নেই। মানে আমি গতকাল যাবার সময় তাঁকে বলে যেতে ভুলে গিয়ে ছিলাম যে, আপনার আদেশ মতো আমি আজ বাইরের কাজ সেরে অফিসে আসব।"

সুবিমল শান্ত হয়, সে আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। তারপর বলে, "তুমি অন্ ডিউটি লিখে সেই ক্রস্-য়ের ওপরেই সই করে দাও আর ছোটসাহেবকে বলো সেখানে ইনিশিয়্যাল করে দিতে। নইলে হয়তো তোমাকে মেমো ইস্যু করে দেবে। আমার সে-রকমই অর্ডার আছে। আণ্ডার এনি সারকাম্‌স্ট্যান্সেস লেট এ্যাটেনডেন্স মাস্ট বি চেক্‌ড।"

"তাই তো কথাটা আপনাকে বলতে হোল স্যার!" ছেলেটি বিগলিত হয়। তারপরে দু'হাত জড়ো করে সুবিমলকে বলে, "আমি তাহলে এখন আসি স্যার।"

"এসো।" সুবিমল অনুমতি দেয়।

ছেলেটি নমস্কার করে বেরিয়ে যায় চেম্বার থেকে।

সুবিমল আমার প্রতি মনোযোগী হয়। কিন্তু কিছু বলতে যাবার আগেই বেয়ারা কফি নিয়ে ঘরে ঢোকে। আমাদের দু'জনের সামনে দু'কাপ কফি রেখে সে ঘর থেকে চলে যায়।

সোজা হয়ে বসে সুবিমল আমাকে বলে, "নিন দাদা. কফি খেয়ে নিন।"

"হ্যাঁ।" আমি কাপটা কাছে টেনে নিই।

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করে, "এবারে বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"তোমাদের বরানগরের কারখানার জন্য কয়েকজন এ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছ?"

"হ্যাঁ। আপনার কোন ক্যাণ্ডিডেট্ আছে নাকি?"

"আছে, আমার এক বন্ধুর ছেলে।"

"ছেলেটাকে ভাল করে জানেন তো?"

"জানি বৈকি।"

"মানে ঐ উগ্রপন্থী-টন্থী নয় তো?"

"বোধহয় না।"

কি একটু ভাবে সুবিমল। তারপর বলে, "কবে এ্যাপ্লিকেশন্ করেছে?"

"গত মাসের দশ তারিখে।"

"কোন চিঠি যায় নি?"

"না"

সুবিমল এক টুকরো সাদা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। বলে, "ছেলেটির নাম-ঠিকানা ও বাবার নাম লিখে দিন।"

আমি কাগজটুকু হাতে নিই।

টেলিফোন বেজে ওঠে। সুবিমল রিসিভার তোলে, "হ্যালো··· স্পিকিং ··দত্ত! কি করলেন মশাই? ··পাঠাচ্ছেন। ক'খানা ··না না, দু'খানায় হবে না। আমি তো বলেছি আপনাকে, আমার অন্তত চারখানা গেস্ট-টিকেট চাই।···না না, তিনখানাতেও হবে না।···যেমন করে হোক্ চারখানা পাঠিয়ে দিন। আজকেই পাঠাবেন কিন্তু···।"

সে রিসিভারটা রেখে দেয়। বিরক্ত কণ্ঠে আমাকে বলে, "আজকালকার মানুষগুলোর স্বভাবই হয়েছে কেবল দরাদরি করা। সেই চারখানাই দেবে, তবু একবার বাজিয়ে দেখছিল। যদি কমে হয়।"

একটু হাসতে হয় আমাকে। তারপরে লেখা কাগজটুকু আমি তার হাতে দিই। সে বেল বাজায়।

বেয়ারা ঘরে আসে। সুবিমল আদেশ করে, "বরুণ দাসকে সালাম দাও।"

বেয়ারা বেরিয়ে যায়। সুবিমল আমাকে বলে, "আজ এসে ভালই করেছেন। কাল থেকে টেস্ট-ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। খেলার ক'দিন অফিসে এসে দেখা পেতেন না আমার।"

"একেবারে অফিসেই আসবে না!" আমি বিস্মিত!

"আসব। খেলার পরে এক ঘণ্টার জন্য, জরুরী কাগজপত্র সই করতে। তখন কারো সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।"

"একটু আগে টেলিফোনে বোধহয় খেলার টিকিটের কথাই হচ্ছিল?" কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারি না।

বিরক্ত কণ্ঠে সুবিমল বলে ওঠে, "আর বলেন কেন? আজকালকার কণ্ট্র্যাকটার ও সাপ্লায়ারগুলো হয়েছে ওয়ার্থলেস।"

"তোমার বুঝি চারখানা টিকেট দরকার?"

"না, না, চারখানায় হবে কেমন করে? বউ ছেলে-মেয়ে শালাশালী, সবাইকে নিয়ে মাঠে যেতে হবে। ভাগ্‌নে ও

ভাইপোদের টিকেট দিতে হবে। তাহলেও আমার খুব বেশি দরকার নয়, খান দশেক হলেই চলে যাবে—ছ'খানা পেয়ে গেছি।"

কি বলব? যেখানে একখানি টিকিটের জন্য হাজার হাজার মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে কিংবা লটারীর টিকেট কিনে নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন করছে, সেখানে সুবিমলের মাত্র দশখানি টিকিট চাই। অতএব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকি।

সুবিমল আবার বলে, "জানেন ওদের আমি লক্ষ লক্ষ টাকার বিল নির্বিবাদে পাস করে দিচ্ছি, আর ওরা কিনা সামান্য কয়েকখানা খেলার টিকিট দিতে চাইছে না। রিয়েলি, দে আর ওয়ার্থলেস।"

"তা তো বটেই।" আমি মাথা নাড়ি।

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেন, "নমস্কার স্যার!"

"বরুণ, বরানগরের কারখানার জন্য যে এ্যাপ্রেনটিস নেওয়া হচ্ছে, তার ইণ্টারভিউ লেটার কে ইস্যু করছে?"

"আজ্ঞে আমি।" সভয়ে উত্তর দেন ভদ্রলোক।

একটু বিস্মিত হই। ভদ্রলোক বয়সে সুবিমলের চেয়ে অনেক বড় অথচ সুবিমল তাকে নাম ধরে ডাকছে এবং 'তুমি' বলছে।

সে আমার লেখা কাগজখানি ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এই ছেলেটি ইণ্টারভিউ পায় নি কেন?"

"আজ্ঞে আপনি যাদের ডাকতে বলেছেন, আমি শুধু তাদেরই চিঠি দিয়েছি।"

"আই সি!" একবার থামে সুবিমল। তারপর বলে, "একে একটা ইণ্টারভিউ লেটার পাঠিয়ে দাও।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

"আর শোন।" সুবিমল আবার বলে, "এর ইণ্টারভিউটা আমি নিজে নেব। আমার ডায়েরী দেখে একটা ডেট্ দিয়ে দিও।"

ভদ্রলোক নমস্কার করে বেরিয়ে যান।

সুবিমল আমার দিকে তাকায়।

আমি সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে উঠি, "অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই।"

সে বোধহয় প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু পেরে ওঠে না। টেলিফোন বেজে ওঠে। সুবিমল ফোন তোলে, "হ্যালো—হ্যাঁ বলো —আরে না, না, আমি ড্রাইভারকে আটকে রাখব কেন? আমি তো অফিসে এসেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি।...এখনও পৌঁছয় নি? কি জানি ক'দিন ধ'রেই একটু ষ্টার্টিং ট্রাব্‌লস হচ্ছিল। রাস্তায় হয়তো খারাপ হয়ে গেছে।...এই ড্রাইভারটাও হয়েছে একটা ওয়ার্থলেস। এ লোকটাকে দেখছি আর না ছাড়লেই নয়।...না না, তা তো বটেই। গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ড্রাইভার কি করবে?...না, মানে, ফোনে তো একটা খবর দিতে পারত।...তা হতে পারে বৈকি, হয়তো এমন জায়গায় গাড়িটা খারাপ হয়েছে যে কাছাকাছি কোন ফোন নেই।...সত্যি, আই এ্যাম্‌ সো সরি অনিতা...প্লিজ, বাহাদুরকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে মার্কেট চলে এসো।...না, না, ট্যাক্সি করে ফিরতে হবে না। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।...কেন গ্লোব সিনেমার সামনে থাকবে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার চেনা কোন ড্রাইভারকেই পাঠাবো।...হ্যাঁ, প্লিজ। এক্‌সকিউজ মি ফর্‌ দা ট্রাব্‌লস অনিতা...বাই বাই।"

সুবিমল ফোন ছেড়ে দিয়ে মৃদু হাসে। লজ্জায় কি আনন্দে বুঝতে পারছি না। আমাকেও একটু হাসতে হয়। সে বলে, "গাড়িটা বাড়ি পৌঁছয় নি। আপনার বৌমা সময় মতো মার্কেটিংয়ে বেরুতে..."

সুবিমল শেষ করে না। আমি মাথা নাড়ি। মুখে বলি না কিছু, মনে মনে ভাবি—তাই ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারকে অ্যাপলজি চাইতে হোল। খুবই স্বাভাবিক।

মেমসাহেবরা সবসময়েই সাহেবদের চেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারিণী। আর এই সহজ সত্যটা সুবিমলের চেয়ে বেশি বোধ করি অনেকেরই জানা নেই। সত্যটা জেনে যথাযথ ভাবে

তার প্রয়োগ করতে পেরেছিল বলেই সুবিমল আজ পদোন্নতির এই স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ করতে পেরেছে।

কিন্তু সুবিমল এতবড় অফিসের সর্বময় কর্তা। সুতরাং সে ব্যস্ত মানুষ। তাছাড়া এখন তাকে গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব আর বসে থাকা সমিচীন নয়। আমি উঠে দাঁড়াই।

"চলে যাচ্ছেন?" সুবিমল জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ"

সুবিমল উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে।

"ধন্যবাদ ভাই।" আমি বলি, "এবারে আসি তাহলে। দেখো, যদি কিছু করতে পারো ছেলেটির জন্য।"

"জানেনই তো সব। ওপরওয়ালা, সরকার এবং য়ুনিয়ন—তিন তরফকেই খুশি রেখে চলতে হয় আমাদের। তাহলেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব দাদা।"

বেরিয়ে আসি সুবিমলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত চমকদার চেম্বার থেকে। তার ঝক্ঝকে অফিস পেরিয়ে নেমে আসি পথে। ফুটপাথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। ভাবতে থাকি সুবিমলের কথা—আজকের নয়, পনেরো বছর আগেকার সুবিমল।

ঘাটশিলায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সুবিমল যে কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সে কোম্পানীর একটা কারখানা আছে ঘাটশিলায়। আমার মেসোমশাই তখন ছিলেন সেখানকার ওয়ার্কস্‌-ম্যানেজার। সেবারে আমি বেড়াতে গেলাম মাসির বাড়িতে।

ঘাটশিলা ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দেখি আমার কিশোরী [illegible] প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে একজন সুদর্শন তরুণ—[illegible] স্মার্ট ও সপ্রতিভ।

[illegible] বোন পরিচয় করিয়ে [illegible] "সুবিমলদা [illegible] কারখানায় কাজ করেন।"

সেদিন আমার হাতের স্যুটকেসটা প্রায় কেড়ে নিয়েছিল সুবিমল। বোনের সঙ্গে রিকসায় চড়ে মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম। সুবিমল সাইকেলে চড়ে সঙ্গী হয়েছিল আমাদের।

শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের বাড়ির পাশেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন মেসোমশাই। জায়গাটার নাম দহি-গোড়া। বাড়ির সামনে রিক্সা থামতেই সুবিমল আমার স্যুটকেশটা নামিয়ে নিল। আমার কোন প্রতিবাদ শুনল না। আর তারপরেই মাসিমার কি একটা ফরমাশ নিয়ে সে আবার যেন কোথায় ছুটল।

সেবারে আমি দিন দশেক ঘাটশিলায় ছিলাম। খুবই বেড়িয়েছি সে ক'দিন। কোনোদিন বিভূতিভূষণের (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছি সুবর্ণরেখার তীরে—তার বালিময় বেলাভূমি ছাড়িয়ে হাঁটুজল পেরিয়ে পৌঁছেছি ওপারে। শাল ও মহুয়ার ছায়ায় বসে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে গল্প করেছি। কোন-দিন গিয়েছি মোহময়ী ফুলডুংরিতে, কোনদিন বা ভয়ঙ্করী রংকিণীদেবীর মন্দিরে।

ভারী আনন্দে কাটছিল দিনগুলো আর তার একমাত্র কারণ সুবিমলের সাহচর্য। সে সর্বদা আমার সঙ্গে থাকত। সকাল দুপুর সন্ধ্যে—যখনই যেখানে গিয়েছি, সুবিমল আমার সঙ্গী হয়েছে।

স্থানীয় সবকিছু দেখা হয়ে যাবার পরে, মাসিমা একদিন সুবিমলকে বললেন, "শঙ্কর তো চলে যাবার দিন এসে গেল, এবারে ওকে একদিন ধারাগিরি থেকে বেড়িয়ে নিয়ে এসো।"

সঙ্গে সঙ্গে সুবিমল সাইকেল নিয়ে ছুটল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সুলেখক শ্রীমুকুল চক্রবর্তীর কাছে। পরদিনই মুকুলবাবুর কাঠের লরীতে চড়ে বহাল তবিয়তে বেড়িয়ে এলাম বিভূতি-ভূষণের স্মৃতিধন্য বাসাডেরা-ধারাগিরি থেকে।

সেদিনই ফেরার পথে সুবিমল কথাটা বলল আমাকে, "দাদা, আমার একটা উপকার করতে হবে আপনাকে।"

আমি তার দিকে তাকালাম। সে বলল, "মেমসাহেব, মানে আপনার মাসিমাকে বলে আমাকে কলকাতার কোন ব্রাঞ্চে একটু বদলি করিয়ে দিতে হবে।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "মাসিমাকে কেন? অফিসের ব্যাপারে তো মেসোমশাইকে বলাই ভাল।"

"না দাদা! তাতে কোন লাভ হবে না। সাহেব বড়ই কড়া লোক। আপনি মেমসাহেবকে বলুন, তাতেই কাজ হবে।"

"তুমি মাসিমাকে বলো নি?"

"বলেছি। তিনি চেষ্টাও করবেন বলেছেন। তবে আপনি বললে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, এই আর কি।"

পরদিনই মাসিমাকে বললাম কথাটা।

মাসিমা বললেন, "আমি তো বলেছি ওনাকে, কথাও দিয়েছেন চেষ্টা করবেন। কিন্তু সুবিমল চলে গেলে আমি যে কি বিপদে পড়ব, তা আমিই জানি।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছেন মাসিমা। তারপরে বলেছেন, "তাহলেও উপায় নেই। ভালো ছেলে—ওর ভবিষ্যতের কথাটাও তো ভাবতে হবে আমাকে।"

মাসিমা থামতেই আমি সেই প্রশ্নটা করেছি তাঁকে, "সুবিমল তো সারাদিনই আপনার বাড়িতে থাকে, সে অফিসে যায় কখন?"

মাসিমা ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছেন, "যেদিন সময় পায় যায়, যেদিন সময় পায় না যায় না। আমি তোর মেসোমশাইকে বলে দিয়েছি, সুবিমল অফিসে না গেলে যেন তুমি ওকে আবার এ্যাবসেণ্ট করে দিও না বাপু!"

এই সেই সুবিমল। নিজের অসুবিধে হবে জেনেও মেসোমসাইকে বলে মাসিমা তার কলকাতায় বদলীর ব্যবস্থা করে ছিলেন। আর তারপরেই তার সামনে পদোন্নতির বদ্ধ-দুয়ার খুলে গিয়েছিল। কারণ ঘাটশিলা ছোট, কলকাতা বড়। ঘাটশিলায় ওয়ার্কস ম্যানেজার আর কলকাতায় জেনারেল

ম্যানেজার। তাই বা বলি কেন? ম্যানেজিং ডিরেক্টরও কলকাতায় থাকেন।

আমার সঙ্গে অবশ্যি সুবিমলের দেখা হয়েছে তার বেশ কিছুদিন বাদে, অন্তত বছরখানেক তো হবেই। সেদিন আমি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে ঢাকুরিয়ার বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখি আমি যে বাসটায় উঠতে যাব, সেই বাস থেকে সুবিমল নেমে এলো।

আমরা দু'জনেই দু'জনকে দেখে খুশি হয়ে উঠলাম। সে-বাসে আর বাড়ি ফেরা হল না আমার। সুবিমলের সঙ্গে গিয়ে পার্কে বসলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সুবিমল জানালো, "আমি এখন কল্যাণীতে আছি।"

"অফিস কোথায়?

"রাণাঘাটে। আমাদের নতুন কারখানা হচ্ছে, আমি তার সিনিয়র সুপারভাইজার হয়েছি।"

"কনগ্র্যাচিউলেশন সুবিমল! কিন্তু রাণাঘাটে তোমাদের কোয়ার্টার নেই?"

"আছে।"

"তাহলে কল্যাণীতে কোয়ার্টার নিয়েছ যে?"

সুবিমল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল যেন। একটা ঢোঁক গিলে সে জবাব দিল, "মানে, আমাদে জেনারেল ম্যানেজার কৃষ্ণাণসাহেব কল্যাণীতে থাকেন কি না।"

বুঝতে পারি ব্যাপারটা। সত্যই তো জি. এম-এর অনুগ্রহ পেতে হলে তাঁর বাংলোর কাছাকাছি বাস করা একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং সে প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন না করে জিজ্ঞেস করলাম, "তা এই অসময়ে কল্যাণী থেকে এখানে এসেছ যে?"

"কল্যাণী নয়, রাণাঘাট থেকে—একেবারে ওয়ার্ক-সাইট থেকে সোজা চলে এসেছি। একবার একটু লেকমার্কেটে যাবো।"

"কেন ?"

"পান কিনতে।"

"পান !" আমি বিস্মিত হয়েছি।

সুবিমল হেসে উত্তর দিয়েছে, "হ্যাঁ। মাদ্রাজী পান।"

"তুমি কি আবার মাদ্রাজী পান ধরেছো নাকি ?"

"না, না আমি নয়। আপনিও যেমন! নিজের জন্য পান কিনতে এই সারাদিন খাটুনির পরে রাণাঘাট থেকে লেকমার্কেটে এসেছি। আবার তো পান নিয়েই ছুটতে হবে শেয়ালদা, সেখান থেকে ট্রেন ধরে কল্যাণী।"

"তাহলে ?" আমি প্রশ্ন করেছি।

সুবিমল উত্তর দিয়েছে, "মেমসাহেবের যে আবার মাদ্রাজী পান না হলে একদিনও চলে না।"

"মেমসাহেব !" বুঝতে পারি না।

সুবিমল বুঝিয়ে দিল, "হ্যাঁ, আমার জি. এম্-এর স্ত্রী মিসেস কৃষ্ণাণ। তিনি বাংলা পান একেবারেই খেতে পারেন না। তাই একদিন অন্তর আমাকে তু' আনার পান নিতে এখানে আসতে হয়।"

"তু' আনার পান কিনতে একদিন অন্তর রাণাঘাট-লেক মার্কেট-কল্যাণী করতে হয় তোমাকে !"

"কি করব বলুন ? মাদ্রাজী পান যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। মেমসাহেব আবার বাসি পান খেতে পারেন না। ফ্রিজে রাখলেও নাকি পানের টেস্ট খারাপ হয়ে যায়।"

হয়তো হবে। আমি পানবিলাসী নই, সুতরাং চুপ করে রয়েছি।

সুবিমল বলেছে, "সত্যি বলতে কি, অফিসের পর এতখানি ছুটোছুটি করতে খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু না করেই বা কি উপায় বলুন!" একবার থেমেছে সে, তারপরে আবার বলেছে, "দাদা, চাকরি যখন করি তখন তো প্রমোশনের চেষ্টা করতেই

হবে। আমাদের দেশে চাকরিতে তিনভাবে প্রমোশন পাওয়া সম্ভব—মামার জোর থাকলে, লেখাপড়ায় খুব ভাল হলে, অথবা বড়সাহেবের স্ত্রীকে খুশি করতে পারলে। মামা এবং লেখাপড়ার জোর যার নেই, তাকে তো মেমসাহেবের ফরমাশ খাটতেই হবে।"

একটু হেসে বলেছি, "খাটছ তো খুব, কোন সুফলের আশা করছ কি?"

"নিশ্চয়ই।" সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে, "শুনে খুশি হবেন, একবছরের স্পেশাল ট্রেনিং নিতে কোম্পানী সারা দেশের সব ব্রাঞ্চ থেকে তিনজন সিনিয়র সুপারভাইজারকে জাপানে পাঠাচ্ছেন। কৃষ্ণাণসাহেব ইস্টার্ন রীজন থেকে আমার নাম রেকমেণ্ড করেছেন। আপনাদের আশীর্বাদে হয়তো চান্সটা পেয়ে যাবো, কারণ বড়সাহেবই হচ্ছেন সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান।"

চান্স পেয়েছিল সুবিমল! যথাসময়ে কোম্পানীর খরচে সে জাপান থেকে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসেছে। আর তারপরেই প্রমোশনের পরে প্রমোশন পেয়ে আজ সে বর্তমান আসনে আসীন হয়েছে। মোটামুটিভাবে ঐ একই ফরমুলায় উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। আর তাই জাপান থেকে ফিরে আসার পরে তাকে কল্যাণী ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ী হতে হয়েছে। কারণ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার আগরওয়ালার বাড়ি বর্ধমান রোডে। কল্যাণীতে বাস করে মিসেস আগরওয়ালার ফরমাশ খাটা সম্ভব নয়।

এবং মিসেস আগরওয়ালা নিজে চেষ্টা না করলে এত অল্প সময়ে সে কিছুতেই ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার হতে পারত না। সুবিমল বলেছে—হার ম্যাজেস্টি নাকি তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। আর তাই সে নিজেকে তাঁর সেবায় উৎসর্গ করেছে।

॥ তিন ॥

চিরসুখী সুখময় সেন।

সুখময় সেন মধ্যবিত্ত মানুষ। অভাব আর অনটন নিয়ে তাঁর জীবন। তবু তিনি সদাহাস্যময়। কারণ দুঃখের চেয়ে সুখ ও কান্নার চেয়ে হাসিকে তিনি বেশি ভালোবাসেন। আর তাই তাঁর প্রতিবেশীরা বলেন—চিরসুখী সুখময় সেন।

কিন্তু আজ এমন মানুষের চোখেও জল। চামেলীর কান্না দেখে কিছুতেই তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

বড় মেয়ে চামেলী। কয়েকমাস আগে বিয়ে দিয়েছেন। ভালই বিয়ে হয়েছে। পুজোতে মেয়ে জামাই বেড়াতে এসেছিল। কাল লক্ষ্মীপুজো। তবু আজ ওরা চলে যাচ্ছে। পরশু জামাইয়ের অফিস খুলবে।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মেয়ের দিকে তাকালেন সুখময়বাবু। ট্রেনটা চলতে শুরু করে দিয়েছে। চামেলী চলে গেল তাঁকে ছেড়ে। একটা ক্লান্তিকর অবসাদ এসে জুড়ে বসল সারা শরীরে। মনটা ভারী হয়ে উঠল। তবু তিনি ভাবেন—এই হোল সংসারের নিয়ম। পরের হাতে তুলে দেবার জন্যই মেয়েকে মানুষ করে তুলতে হয়।

দু'খানি সাইকেল রিক্সায় চেপে বাড়ি ফিরে চলেন। স্ত্রী জয়শ্রী, ছেলে শান্তি ও ছোট মেয়ে ছবিকে নিয়ে ষ্টেশনে এসেছিলেন সুখময়বাবু। শান্তি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ছবি বি. এস. সি. পড়ছে। ওদের নিয়েই তাঁর সংসার—সুখের সংসার। সুখী মানুষ সুখময় সেন।

বৃষ্টিতে ভিজে ষ্টেশনে এসেছেন, বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়ি ফিরে চলেছেন। যে রকম মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, রিক্সার হুড্-য়ের সাধ্য

কি রক্ষা করে। পরশু থেকে এমনি একটানা বর্ষণ চলেছে। তবু রক্ষে, পুজোর পরে বৃষ্টিটা নেমেছে। নইলে চামেলীদের বেড়াতে আসাটা একেবারেই মাটি হোত। তাও তো সাতদিনের মধ্যে তিনদিন ওরা বৃষ্টির জন্য বাইরে যেতে পারে নি।

অকাল বর্ষণ—বড়ই বিরক্তিকর। মফঃস্বল হলেও রাস্তার জন্য খ্যাতি আছে এ শহরের। সেই রাস্তার এ কি হাল হয়েছে ? তার ওপর আজ আবার দুপুর থেকেই বিদ্যুৎ বন্ধ। কোথায় আজ চতুর্দশীর চাঁদ তার রূপালী আলোয় মোহময়ী করে তুলবে বসুন্ধরাকে আর সেখানে বর্ষণ-বিকৃত আঁধার পৃথিবী। বৃষ্টি বন্ধ না হলে কাল লক্ষ্মীপুজোই বা কেমন করে হবে ?

পাড়ার ছেলেরা এই বৃষ্টির মধ্যেই পুজার আয়োজন করেছে। সুখময়বাবুও সকালে বৃষ্টিতে ভিজে লক্ষ্মীপুজার বাজার করেছেন। জয়ন্ত্রী তখন বলছিল, বিকেলে বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু বৃষ্টি থামে নি, বরং বেড়েই চলেছে।

সাইকেল-রিক্সার ক্ষীণ আলোয় পথ চিনে ওরা বাড়িতে পৌঁছয়। জয়ন্ত্রী বলে, "আজ আর রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। ষ্টোভ জ্বালিয়ে বড় ঘরে বসেই চালে-ডালে ফুটিয়ে নিই।"

আপত্তি করেন না সুখময়বাবু। রান্নাঘরটা বাড়ি থেকে আলাদা। ছাতি মাথায় দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। তার ওপর আলো নেই। আজ বোধহয় আর আলো জ্বলবে না। তাছাড়া বর্ষার রাতে খিচুরি ভালই লাগবে।

মোমের মৃদু আলোয় নৈশভোজ সমাধা করে শুয়ে পড়েন সুখময়বাবু। পরিত্যক্ত রান্নাঘরে তালা দিয়ে দরজায় খিল দেয় জয়ন্ত্রী। তারপর সেও গিয়ে ওপাশের খাটে মেয়েব সঙ্গে শয্যা নেয়। শান্তি পাশের ছোটঘরে আগেই চলে গেছে। দু'খানি ঘর আর বারান্দা নিয়ে সুখময়বাবুর বাড়ি—ছোট বাড়ি।

শুয়ে পড়লেও ঘুমোতে পারছেন না সুখময়বাবু। সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার রাত। ইদানিং বড়ই ছিঁচকে চোরের আমদানি

হয়েছে শহরে। গয়না থেকে পান্তাভাত পর্যন্ত যা পায়, তাই চুরি করে তারা। একটু সজাগ থাকা ভাল।

কিন্তু সেই জন্যেই কি সজাগ রয়েছেন সুখময়বাবু?

না। তাঁর একটু শীত শীত করছে। কিন্তু কথাটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। জয়ত্রী খুবই পরিশ্রান্ত, বৃষ্টি মাথায় করে সারাদিন কাজ করেছে। ভাল-মন্দ রান্না করে জামাইকে খাইয়েছে। তাছাড়া চামেলী চলে গেছে, তাঁর মনও ভাল নেই। কাল লক্ষ্মীপুজোর উপোস। কাজেই কাঁথা কিংবা কম্বলের কথা বলে জয়ত্রীর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছেন না তিনি।

কিন্তু শীতের জন্যই কি ঘুম আসছে না সুখময়বাবুর চোখে?

অসময়ে এত বৃষ্টি হয়তো আর কোনদিন হয় নি। কিন্তু অসময়ে বৃষ্টি তো এমন কিছু নতুন নয় এ শহরে। জীবনের অনেকগুলি বছর কেটে গেল এখানে। কাজেই শীতের জন্য ঘুমোতে পারছেন না, কথাটা সত্য নয়।

তবে কি চামেলী চলে গেল বলে?

না, তাও নয়। আসল কারণ শোবার পরে কিছুক্ষণ বই না পড়তে পারলে ঘুম আসে না সুখময়বাবুর। সরকারী অফিসার তিনি। তবু সই করে দিন কাটে না তাঁর, হাতে-কলমে কাজ করতে হয়। অফিস থেকে ফিরে আসতে রাত হয়ে যায়, খিদে পায়। একেবারে খেয়েদেয়ে বই নিয়ে বসেন। অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করেন।

আজ তা পারেন নি সুখময়বাবু। বদভ্যাস হয়েছে, ইলেকট্রিক লাইট না হলে রাতে চোখে দেখেন না। অথচ পূর্ববঙ্গের মানুষ। ছাত্রজীবনে হ্যারিকেন, মোম আর মাটির প্রদীপেই পড়াশুনা করেছেন। বয়স বেড়েছে কিন্তু তাঁর চোখ বেশ ভালই আছে, এখনও চশমা নিতে হয় নি। তবু মোমের আলোয় পড়তে অসুবিধে হবে বলে আজ আর বই নিয়ে বসেন নি সুখময়বাবু।

নানা চিন্তার ফাঁকে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলেন,

মনে পড়ছে না সুখময়বাবুর। ঘুম ভাঙ্গল জয়ত্রীর ডাকে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসেন। জিজ্ঞেস করেন, "কি ব্যাপার?"

জয়ত্রী টর্চ জ্বালায়। বলে, "কারা যেন চিৎকার করছে?"

"নিশ্চয়ই চোর।" লাফ দিয়ে নিচে নামেন সুখময়বাবু। জয়ত্রীর হাত থেকে টর্চটা নেন।

"খালি হাতে একা কোথায় যাচ্ছ?" চেঁচিয়ে ওঠে জয়ত্রী। ইতিমধ্যে ছবি এসে দাঁড়িয়েছে মায়ের পাশে। সেও বলে, "বাবা একা যেওনা তুমি।"

"তোরা বড্ড ভীতু।" বিরক্ত হন সুখময়বাবু। বলেন, "আমি কি চোর ধরতে যাচ্ছি। একবার দেখছি রান্নাঘরটা ঠিক আছে কিনা?" পেছনের দরজা খোলেন তিনি।

"কি হয়েছে মা?" শান্তি আসে এ ঘরে। সে-ও বাবার পিছনে বেরিয়ে যায়। মা আর মেয়ে তাদের অনুসরণ করে।

না, রান্নাঘরের তালাটা ঠিকই আছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বৃষ্টিটাও কমে এসেছে, একটু একটু পড়ছে। মনে হচ্ছে সকালের আগেই থেমে যাবে। তাই হোক, রাত পোহালেই লক্ষ্মীপুজার পূণ্যতিথি। সত্য-স্বরূপিনী দেবী-নারায়ণী ক্ষমাশীলা, অবস্থা নির্বিশেষে সকল গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী। তিনি কি নির্দয়া হতে পারেন? যার যেমন সামর্থ্য, তেমনি ভাবেই সবাই দেবীপুজার আয়োজন করেছে। মায়েরা উপোস করবেন, মেয়েরা আলপনা দেবে, শিশুরা ফুল তুলবে। মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে শহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হবে। ঢাক বাজবে, ঢোল বাজবে, শাঁখ বাজবে, কাঁসর বাজবে। আনন্দের বন্যা বইবে।

নিশ্চিত হয়ে ঘরে আসেন সুখময়বাবু। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজে। আঁধার রাত্রির অবসান আসন্ন। দিন আগত ঐ—শুভদিন।

কিন্তু শুয়ে পড়ে আবার উঠে বসতে হয় সুখময়বাবুকে। চিৎকারটা যেন ক্রমেই বাড়ছে। চারিদিক থেকেই শব্দটাআসছে।

কি ব্যাপার! চোর তাড়াবার চিৎকার তো এমন হওয়া উচিৎ নয়। সাধারণতঃ আগুন লাগলে এ রকম দীর্ঘস্থায়ী চিৎকার হয়। কিন্তু তিনদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, আগুন লাগা যে-অসম্ভব। তাহলে কি হয়েছে? কেন চিৎকার করছে ওরা?

সামনের বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই চিৎকার স্পষ্টতর হয়। চিৎকার নয়, সমবেত আর্তনাদ। সেই সঙ্গে একটা শোঁ শোঁ শব্দ।

বারান্দার দরজা খুলে পথে আসেন সুখময়বাবু। হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই, আর্তনাদের আতঙ্কিত চিৎকার—বাঁচাও বাঁচাও··· জল, জল···

দলে দলে মানুষ ছুটছে···অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুরদল। কোথায় যাচ্ছে, কেন ছুটছে, কেন চিৎকার করছে ওরা? কেন, কেন, কেন?

"পালান শিগগীর পালান, জল আসছে, জল ··" ওরা সুখময়-বাবুকে বলতে বলতে চলে।

শোঁ শোঁ শব্দটা পরিণত হয়েছে বুম্ বুম্ ধ্বনিতে। হঠাৎ সুখময়বাবুর পায়ে শীতল স্পর্শ লাগে, তিনি চমকে ওঠেন—জল।

জল এসে গেছে, বান এসে গেছে। সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

নিচু বাড়ি—সরু দেওয়াল আর টিনের পুরনো চাল। ডুবে যাবে, ভেঙ্গে যাবে, ভেসে যাবে।

"এখুনি বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।" সুখময়বাবু বারান্দায় উঠে বলে ওঠেন।

"কোথায়?" জয়ত্রীর জিজ্ঞাসায় কান্না ঝরে পড়ে।

"জানিনা।"

"কেন?" ছবি কেঁদে দেয়।

"কাঁদিস নে মা। কাঁদার সময় নেই, বন্যা এসেছে। আয় শিগ্‌গীর বেরিয়ে আয় বাড়ি থেকে।" সুখময়বাবু বলেন।

"কিন্তু কোথায় যাবো আমরা?" জয়ত্রী আবার জিজ্ঞেস করে।

হারিয়ে গেল তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। চিৎকার করে ডেকে ওদের খুঁজেছে অরুণ। বৃথাই ডাকাডাকি করেছে, কেউ সাড়া দেয় নি। কোনদিনই তারা আর অরুণের ডাকে সাড়া দেবে না।

তারপর কেমন করে সে এই হোটেলে পৌছল, তা সে জানে না। কেন যে বেঁচে আছে, তাও জানে না। শুধু বুঝতে পারছে এর চেয়ে তার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। তার কেউ নেই, কিছু নেই। সে যে পাগল হয়ে যাবে। পাগলের মতই প্রলাপ বকছে অরুণ।

সুখময়বাবু হাত ধরে অরুণকে পাশে বসান। চোখের জল মুছিয়ে দিতেই অরুণ তাঁর কোলে মুখ লুকোয়। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সুখময়বাবু সান্ত্বনা দেন, "কেঁদে কি হবে ভাই! যারা যায়, তারা তো আর ফিরে আসে না। প্রাণটা যখন বেঁচেছে, তখন দেহটাকে সুস্থ করে তোলো। তুমি তো একা নও, সর্বনাশী বন্যায় হাজার হাজার লোক তোমার মতো সর্বস্বান্ত হয়েছে।"

কালরাত্রির অবসান হোল, দেখা দিল লক্ষ্মীপূজার প্রভাত। কিন্তু এ প্রভাত উৎসবমুখর নয়। আশার আলোয় আলোকিত হয় নি আজকের পৃথিবী। নিরাশা আঁধার ধরণীর বুকে নেমে এসেছে আলোর মুখোস পরে। কান্না আর কান্না, রিক্ততা আর শুন্যতায় ভরা এ প্রভাত—লক্ষ্মীপূজার পুণ্যপ্রভাত।

সকলে উদগ্রীব হয়ে তাদের পরিচিত পৃথিবীটাকে দেখতে চায়। কিন্তু কোথায় ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা? কোথায় সেই জনপদ, সেই শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সেই পথ প্রান্তর? যেদিকে তাকানো যায় কেবল জল আর জল। জল ছাড়া আর কিছু নেই। ঘর নেই, ক্ষেত নেই, মাটি নেই। মাটি মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। সব কিছু তলিয়ে গেছে জলের তলায় মাটি না থাকলেও মানুষ আছে। টিনের চালে, বাড়ির ছাদে, গাছের

ডালে—সর্বত্র মানুষ। জলস্রোতেও মানুষ। মৃত মানুষের দল বন্যার জলে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। অর্ধমৃত মানুষগুলি চারিদিকে বাদুরের মতো ঝুলে আছে। কেউ তাদের রক্ষা করছে না। মানুষকে রক্ষা করার মতো মানুষ নেই।

আছে, মানুষ আছে। মানুষ অজয় অমর অক্ষয় অব্যয়। প্রকৃতির সাধ্য কি তাকে মুছে ফেলে মাটির জগৎ থেকে। সে সাগর জয় করেছে, পাহাড় জয় করেছে, মহাশূন্য জয়যাত্রায় নেমেছে।

মানুষ আসে। আসে পরদিন দুপুরে। এই দু'দিন অবশ্য ওদের অভুক্ত থাকতে হয়েছে। হোটেলে সামান্যই খাবার ছিল। সবাই মিলে কাল একবেলা খেতেই তা ফুরিয়ে গেছে। সবচেয়ে কষ্ট হয়েছে জলের জন্য। পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু কোথাও জল নেই। চারিদিকে জল অথচ তৃষ্ণার জল নেই।

ওরা সমস্ত শারীরিক কষ্ট সহ্য করেও সজাগ রয়েছে। অসহায় দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেছে প্রকৃতির তাণ্ডব—বন্যার ধ্বংস-লীলা। মুহূর্তে জল বেড়েছে—বাড়ির দেয়াল, টিনের চাল গেছে তলিয়ে। সশব্দে ভেঙ্গে পড়েছে বাড়িঘর। কতো কিছু ভেসে এসেছে—হাঁড়ি-কড়া গাছপালা গরু-ঘোড়া আর মানুষ।

নিমজ্জমান মানুষ একবার উর্দ্ধে হাত-পা তুলে তলিয়ে গেছে। তারা কি যাবার আগে কাউকে অভিসম্পাত দিয়েছে, যেমন দিচ্ছে এরা? তাদের মনেও কি এদের মতো কোন প্রশ্ন ছিল—কোথা থেকে এতো জল এলো? কেন এলো? কার জন্য এলো? কি শাস্তি হবে তাদের?

শুনে হাসি পেয়েছে সুখময়বাবুর। বলেছেন, "কি লাভ তাদের শাস্তি দিয়ে।"

তাদের উত্তর শুনে আবার হেসেছেন সুখময়বাবু। কিন্তু আব কিছু বলেন নি। মনে মনে ভেবেছেন—এরপরে স্বভাবতই কর্তৃপক্ষ সজাগ হবেন। বৈঠকের পর বৈঠক বসবে। বন্যা সংকেত ও বন্য নিয়ন্ত্রণের নতুন নিয়ম কানুন প্রচলিত হবে।

কিন্তু এমন বৃষ্টি, এমন বন্যা আর বহুদিন হবে না। কারণ তাই প্রকৃতির নিয়ম। ফলে সমস্ত আয়োজন মাঠে মারা যাবে। তারপরে আবার সব ব্যবস্থা শিথিল হবে। সবাই সবকিছু ভুলে যাবে। একদিন প্রকৃতি আবার এমনি রুদ্র মূর্তি ধারণ করবে। তখন দেখা যাবে, আমরা ঠিক এখনকার মতই অসতর্ক, স্বার্থ-সর্বস্ব ও দায়িত্বজ্ঞানহীন।

দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে ভাবনা-চিন্তা, জল্পনা-কল্পনা ও সমালোচনায় ভরা দুটি দিনের অবসান হয়েছে। তারপরে ওরা এসেছে। না মানুষ বলে কেউ মনে করে না যাদের। ওরা আড্ডাবাজ জুয়াড়ী ও মাতাল। ওরা লেখাপড়া করে না, গুরুজনদের মানে না, ভদ্রতা জানে না। ওরা মারামারি করে, চাঁদা আদায় করে আর পাড়ার মেয়েদের উত্যক্ত করে। সেই সব বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো অমানুষগুলি মানুষের মূর্তি ধরে এসেছে। এসেছে সেবা-শ্রমের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে।

ওরা এলো তৃষ্ণার জল আর ক্ষুধার খাদ্য নিয়ে। এলো নিরাশার মধ্যে আশার আলো নিয়ে এলো মৃত্যুর মাঝে জীবনের জয় গান গেয়ে।

ওরা খাদ্য দেয়, জল দেয়, বস্ত্র দেয়। অসুস্থদের ওষুধ দেয়, আহতদের শুশ্রূষা করে। নিজেরা কিন্তু ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। পরিশ্রান্ত দেহে ওরা অক্লান্ত ভাবে মানুষের সেবা করে যায়। ওরা আশার বাণী শোনায়—মানুষ অমৃতের পুত্র। সে ধ্বংসের ওপরে গড়ে তোলে সৃষ্টির সৌধ।

জল কমতে শুরু করেছিল কাল রাত থেকেই। আজ বিকেল নাগাদ জল নেমে গেল। এ পাড়াটা শহরের কেন্দ্রস্থলে উঁচু জমিতে অবস্থিত। তাই বোধ হয় জলটা তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

পথের দিকে তাকিয়ে সুখময়বাবুর মনে হয় এবারে বাড়ি

যাওয়া যাবে। কিছুই হয়তো নেই, সবই ভেসে গেছে। তবু যাওয়া দরকার, ঘর যে গৃহস্থের বড় আপনার।

স্ত্রী ও মেয়ে আপত্তি করে। কিন্তু সুখময়বাবু তাদের কথা কানে তোলেন না। ছেলেকে নিয়ে নেমে আসেন পথে। পথ নয়, পলির পাহাড়—পুতিগন্ধময়। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ। তারই ওপর দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। শেষ হয়েছে প্রকৃতির ধ্বংস-লীলা, এবারে মানুষের সৃষ্টির পালা। এরই নাম জীবন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে জয়লাভ করেছে বলেই মানুষ আজ অমৃতের সন্তান।

॥ চার ॥

টিকিয়াপাড়া······দাশনগর··· ··রামরাজাতলা······

পাঁশকুড়া লোক্যাল ছুটে চলেছে। শ্যামলী বাড়ি যাচ্ছে। আজ শনিবার ওর বাড়ি যাবার দিন। রোববার সন্ধ্যে থেকে শনিবার সকাল অবধি শ্যামলী হোস্টেলে থাকে—ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে। শনিবার অফিস করে সোজা হাওড়া চলে আসে, বাড়ি যায়। মার কাছে কাটিয়ে আসে একটা দিন।

শ্যামলী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈকা কেরানী। শনিবার দেড়টায় ওর অফিস ছুটি। সাধারণত সে আড়াইটের গাড়ি ধরে। আজ চলেছে সাড়ে এগারোটার লোক্যালে। আজ সে অফিসে সই করেই হাওড়া রওনা হয়েছে। বড়বাবুকে বলে এসেছে। আজ যে ওর জন্মদিন।

আচ্ছা, শ্যামলী আজ ক'বছরে পড়ল—বিশ না একুশ? না, ঠিক মনে করতে পারছে না। কেমন করে পারবে? সেই যে আঠারো বছরে হায়ার-সেকেণ্ডারী পাশের ঝামেলা! স্কুলে ভর্তি হবার সময় বাবা তার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবে সে বাইশ বছরে বি. এ. পাশ করেছে। তাঁদের খাতায় ওর এখন তেইশ চলেছে। কিন্তু সেটা শ্যামলীর সঠিক বয়স নয়।

শ্যামলীর মনে থাকে না, অথচ অসীম কখনও ভুলে যায় না। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে বসে কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছে সে। আর মনেই বা থাকবে কেমন করে? সে যে

তার কাছে এখনও 'চাইল্ড লাভার'। আজ একা একা বাড়ি যাবে বলে কাল সারাটা সন্ধ্যে সে শুধু বসে বসে শ্যামলীকে উপদেশ দিয়েছে।

অসীম তার দাদার বন্ধু। ওর দাদার অকাল মৃত্যুর পর থেকেই সে পরিবারের বন্ধু। দাদার আকস্মিক মৃত্যুর পরে তাদের জন্য সে যা করেছে. তার তুলনা হয় না। শ্যামলীর লেখাপড়া ও চাকরি সবই তার জন্যে। অসীমের সঙ্গে যে তার বিয়ে হবে একথাও সবাই জানে। তবু ওকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসতে শ্যামলীর ভারী লজ্জা করে।

অসীম কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে। তাই তার শনিবার নেই। শনিবার ওর সঙ্গে শ্যামলীর বড় একটা দেখা হয় না। আজও হয় নি। এবার সে আর জন্মদিনে প্রণাম করতে পারল না ওকে। কাল সন্ধোটা অবশ্যি ওরা দুজনে একসঙ্গেই কাটিয়েছে। অসীম ওকে হোস্টেল পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়েছে। কিন্তু সে শ্যামলীর প্রণাম নেয় নি। বারবার সেই একই কথা বলেছে—কালকের প্রণাম আমি আজ কিছুতেই নেব না। একান্তই যদি জন্মদিনে আমাকে প্রণাম করতে চাও. তাহলে কাল আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে বাড়ি যেতে হবে।

শ্যামলী সে প্রস্তাবে রাজী হতে পারে নি।

প্রেজেণ্টেশন্‌টা কিন্তু নিতে হয়েছে। নিতে হয়েছে মানে অসীম একেবারে গলায় পরিয়ে দিয়েছে—ইমিটেশন গোল্ডের চমৎকার একছড়া সীতাহার।

এবারে অসীম একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ইমিটেশন হলে কি হবে হারটা ভারী সুন্দর। দাম শ'খানেক টাকার কম নয়।

শুধু কি তাই, আরও একটা বিপদ বাঁধিয়েছে অসীম। মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে—আগামীকাল সারাদিন তোমাকে এই হারটা পরে থাকতে হবে।

বড্ড মুশকিলে পড়েছে শ্যামলী। বাড়ি গেলেই তো মা আর বোনেরা জিজ্ঞেস করবে—কবে কিনলি? কত দাম?

কি উত্তর দেবে সে ? চাকরি করলেও বাড়িতে সে মাসে শ' দেড়েক টাকার বেশি দিতে পারে না। এ অবস্থায় তার পক্ষে একশ' টাকা দিয়ে হার কেনা রীতিমত বিলাসিতা। অথচ লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারবে না। তবে ছোট বোন সুমিতা মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

এখন শ্যামলীরা তিন বোন ও এক ভাই। সুমিতা বাগনান কলেজে বি-এস-সি পড়ছে। শেফালী ও সলিল স্কুলে পড়ে। সুমিতা অবশ্য প্রায়ই বলে—অসীমদাকে বলে আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দে। তারপরে তোরা বিয়ে করে ফেল। অসীমদা যে আর তোর বিরহ সইতে পারছে না দিদি !

—ফাজিল কোথাকার বলে শ্যামলী সুমিতার গাল টিপে দিলেও সে জানে কথাটা মিথ্যে নয়।

তবে অসীম কিন্তু অন্যকথা বলে। সে বলে—পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সুমিতার এখন চাকরি নেবার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে এক কাজ কর, যতদিন ওরা স্বাবলম্বী না হয়, ততদিন তুমি মাইনের সব টাকাটাই তোমার মাকে দিয়ে দিও। দুজনের সংসার, যেভাবে হোক আমি একাই চালিয়ে নেব।

রাজী হয়নি শ্যামলী। কেমন করে হবে ? অসীমটা যে বড্ড বোকা ! দুজনের সংসারে কি চিরকাল দুজন থাকে ? তখন কি হবে ? এই বাজারে ছেলে-মেয়ে মানুষ করা কি সোজা কথা ?···

—শুনছেন ?

শ্যামলীর ভাবনা থেমে যায়। তাকে বলছে কি ?

—শুনছেন, এই যে আমি আপনাকেই বলছি···

শ্যামলী পাশে তাকায়। ছেলেটি বোধকরি তারই সমবয়সী হবে। পাশের সিটে বসে আছে, আর তাকে ছাড়া কাকেই বা বলবে ? অসময়ের গাড়ি। লোকজন খুবই কম। কাছাকাছি যাত্রী নেই কোন। খানিকটা দূরে দরজার ধারে কেবল কয়েকজন বসে রয়েছেন।

ছেলেটি শ্যামলীর কাছে আরও এগিয়ে আসে। তার গায়ের

রঙটি ফরসা কিন্তু সে বড়ই রোগা। পরনে সাধারণ জামা-প্যাণ্ট। মুখখানি শুকনো, দেখলে মায়া হয়।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে—কি বলছেন ?

ছেলেটি একটা ঢোক গিলে প্রশ্ন করে—না, মানে আপনি তো দেউলটি যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। আপনি জানলেন কেমন করে ?

—ঠিক জানি না। তবে কেন যেন মনে হল, তাই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। কাইণ্ডলি কিছু মনে করবেন না।

শ্যামলী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি বলে উঠে—না, না, মনে করব কেন ? এতে মনে করবার কি আছে ? আপনি কোথায় নামবেন ?

ছেলেটি একটু হাসে। শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়—দেউলটি।

—ভারী মজার তো !

—এমনি হয় শ্যামলীদেবী !

শ্যামলী ছেলেটির দিকে তাকায়। ছেলেটি বলে চলে—কোথায় ছিলেন আপনি, আর কোথায় ছিলাম আমি ? আপনি যাচ্ছেন বাড়ি আর আমি যাচ্ছি শরৎবাবুর বাড়ি, আমাদের গন্তব্যস্থল এক। কোন-এক অদৃশ্য শক্তি, তাই আমাদের এক কামড়ায় এনে পাশাপাশি সিটে বসিয়ে দিয়েছেন।

—আপনি বুঝি সামতাবেড়ে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমাদের পাশের গ্রাম, পানিত্রাস।

—আচ্ছা, আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কেমন করে আপনার নামটি জানতে পারলাম ?

শ্যামলী একটু হাসে। তারপর নিজের বাঁহাতখানি তুলে ধরে ছেলেটির চোখের সামনে। বলে—এটা দেখে।

ওর অনামিকায় একটি নাম লেখা আংটি। অসীম দিয়েছে—এনগেজমেণ্ট রিং। তাই এটা ওকে সব সময় পরে থাকতে হয়।

ছেলেটি চুপ করে থাকে। শ্যামলী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠে—কেমন জব্দ ?

—না ! আপনাকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম, আপনি দেখছি ততটা বোকা নন।

—মানে ! আপনি আমাকে বোকা ঠাওরেছিলেন !

—হ্যাঁ। নইলে এই বাজারে কোন মেয়ে কোন অচেনা ছেলের সঙ্গে এমন মন খুলে আলাপ করে ?

—করলে কি হয় ?

—জানেন, আমি আপনার কত ক্ষতি করতে পারি ?

—যেমন ? শ্যামলীর ঠোঁটে হাসি।

ছেলেটি উত্তর দেয়—আমি আপনাকে ফুস্‌লে নিয়ে যেতে পারি, আপনার ঘড়ি-আংটি ছিনতাই করতে পারি, এমন কি আপনার শ্লীলতাহানি পর্যন্ত করতে পারি।

—একবার চেষ্টা করেই দেখো না, এক থাপ্পড়ে একেবারে কৈলাস দেখিয়ে ছেড়ে দেব।

—সাব্বাস ! আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। আমাদের বন্ধুত্ব যখন হয়েই গেছে, তখন আর এই 'আপনি আজ্ঞে' গুলোর কোন মানেই হয় না। আর আমিও তোমাকে বার বার ঐ দেবী বলতে পারছি না, তার চেয়ে বরং······

—থামলে কেন বলো। শ্যামলী তাকে শেষ করতে বলে।

—তার চেয়ে আমি তোমাকে শ্যামলী বলে ডাকি, আর তুমি আমাকে বিমানদা বলে ডেকো।

—তা আর বলতে ! লজ্জা করছে না তোমার ? বয়সে ছোট হয়েও দাদা সাজতে চাইছ !

—বেশ, আগে তাহলে বয়সের হিসাবটাই হয়ে যাক্।

—হয়ে যাক্।

- তুমি কোন সালে বি. এ. পাশ করেছো ?

—গত বছর।

বিমান চুপ করে থাকে।

শ্যামলী সোচ্চার কণ্ঠে প্রশ্ন করে—কি, চুপ করে রইলে কেন?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিমান উত্তর দেয়—তোমার চেয়ে বয়সে বড় হতে পারলাম না বলে। আমিও গত বছরেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

—তাহলে তো আমি তোমার দিদি।

—কেন?

—মেয়েরা একটু বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়।

—না, না, তুমি তো খুবই কম বয়সে পাশ করেছো।

—তা তো বটেই। আর সে সংবাদটা তুমি ছাড়া কেই বা জানবে বলো? যাক্ গে, পাশ করে কি করছ?

—কিছুই না।

—কেন?

—পাশ করতে পারলাম না বলে।

শ্যামলী একটু চুপ করে থাকে। তারপরে বলে—এ বছর আবার পরীক্ষা দিচ্ছ নিশ্চয়?

—না।

—কেন?

—কি হবে বার বার ফেল করে?

—ফেল করবে কেন?

—পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না। তার চেয়ে এই তো বেশ আছি। তোমাদের মতো ছকে বাঁধা জীবন নয় আমার। মুক্ত বিহঙ্গের মতো যখন যেখানে ইচ্ছে চলে যাই—শান্তিনিকেতন, কেঁদুলি, দেবানন্দপুর, সামতাবেড়ে,···

—তুমি বুঝি মাঝে মাঝেই সামতাবেড়ে আসো?

হ্যাঁ। শরৎচন্দ্রের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একা একা বসে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে, আমি যে সেখানে তীর্থের পরশ

পাই। শুনতে পাই—গফুরের আর্তনাদ, পার্বতীর কান্না আর অন্নদাদিদির দীর্ঘশ্বাস ……।

বিমান চুপ করেছে। শ্যামলী তবু তাকিয়ে আছে তার দিকে।

একটু বাদে বিমান জিজ্ঞেস করে—অমন করে কি দেখছ আমার মুখে?

—তুমি কি কবি?

হো হো করে হেসে ওঠে বিমান। গাড়ির সকলের দৃষ্টি পড়ে ওদের দিকে। কেউ বা তাকিয়ে থাকে কেউ বা মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ওরা কিন্তু নির্বিকার। যেমন বেপোরোয়া ভাবে পাঁশকুড়া লোক্যাল ছুটে চলেছে গন্তব্যস্থলের দিকে, ওরা তেমনি বেপরোয়া ভাবেই নিজের কথা বলে চলে।

বিমান বলে—তুই কি পাগল হয়ে গেলি? আবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ফেলি আর বিজনদা আমাকে স্টেট্ ব্যাংকে ঢুকিয়ে দিক।

—সেকি! স্টেট্ ব্যাংকে চাকরি দেবার মতো জানশোনা লোক তোর আছে নাকি?

—না থাকলে আর বলছি কেন? এইতো গত মাসে ধনপতিবাবু আর বিজনদাকে ধরে আমার বন্ধু শৈলেনকে ঢুকিয়ে দিলাম। তাকে অবশ্য শ' পাঁচেক টাকা খরচ করতে হয়েছে।

—পাঁচশ টাকায় স্টেট্ ব্যাংকের চাকরি!

বিমান মৃদু হাসে। বলে—পাঁচশ টাকা কি কম হল রে?

—তোর বন্ধু তো প্রথম মাসেই পাঁচশ টাকা মাইনে পেয়ে যাবেন!

—তা পাবে। আর টাকাটা ওকে একসঙ্গে দিতেও হয় নি।

—তাহলে?

—ইণ্টারভিউ পাবার আগে দুশো, বাকিটা দিয়েছে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ পেয়ে!

—তার মানে মাত্র দুশো টাকার রিস্‌ক নিলেই স্টেট্ ব্যাংকের চাকরি ?

—সবার হয় না। অন্তত গ্রাজুয়েট হওয়া চাই।

—আরে গ্রাজুয়েট তো আমিও।

—তুই তো চাকরি করছিস।

—না বিমান তুই সত্যি একটা আস্ত বোকা। স্টেট্ গভর্ণমেণ্টের চাকরি, আর স্টেট্ ব্যাংকের চাকরি ! কোন তুলনা হয় ?

—তা অবশ্য হয় না, তবে তুই কি সত্যি-সত্যি ইণ্টারেস্টেড্ নাকি ?

—ইণ্টারেস্টেড্ মানে, ভীষণ ইণ্টারেস্টেড্। একবার থামে শ্যামলী। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করে—এখনও লোক নিচ্ছে নাকি ?

বিমান বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে, কি যেন ভাবছে। গাড়ির গতি কমছে, বাগনান এসে গেল। ওদের গন্তব্যস্থানও সমাগত* প্রায়। তবে শ্যামলী সে ওসব ভাবছে না, এখন তার মাথায় স্টেট্ ব্যাংকের চাকরি। চাকরিটা পেলে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নিজের সংসারের দিকে নজর দিয়েও সে মাসে মাসে অন্তত শ' দুয়েক টাকা দিতে পারবে মাকে। কিন্তু বিমান এমন চুপ করে আছে কেন ?

হঠাৎ মুখ ঘোরায় বিমান। শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—আজ শনিবার না ?

শ্যামলী মাথা নাড়ে।

অকস্মাৎ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে বিমান—আরে তাইতো, সোমবারই যে আটাশে, সেদিনই তো ইণ্টারভিউ। একবার থামে সে। তারপরে হতাশ স্বরে বলে—নো, নো শ্যামলী, আই অ্যাম ভেরি সরি ! এবারে তোকে আমি কিছুই করে দিতে পারলাম না। ···ইস্ ! একটা দিন, জাস্ট্ একটা দিন আগে যদি দেখা হত, আই কুড হ্যাভ ডান্ সামথিং ফর ইউ।

বিমান থামে। শ্যামলী অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার

দিকে। বিমানের বোধ করি মায়া হয়। সে বলে—বুঝতেই তো পারছিস এ্যাপলিকেশন করবার লাস্ট ডেট অনেকদিন আগেই এক্সপায়ার করেছে। ইণ্টারভিউ কল করা হয়ে গেছে। তবে···

—কি? শ্যামলীর স্বরে উৎকণ্ঠা।

ধনপতিবাবুকে একবার ধরতে পারলে হয়তো একটা কিছু হলেও হতে পারে।

—তিনি কে?

—ওদের এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশনের হেড ক্লার্ক।

—ধরা যায় নাকি?

—তা যায়। ভদ্রলোক তো আমাদের পাড়াতেই থাকেন, সালকিয়ার অক্ষয় চ্যাটার্জী লেনে। কিন্তু বিজনদাকে সঙ্গে না নিয়ে তাকে ডাইরেক্ট ধরলে লোকটা পেয়ে বসবে। প্রচণ্ড ঘুষখোর।

—তা হোকগে। কত দিতে হবে?

—শ' তিনেকের কমে সে শুনবে কি? মানে এটা শুধু ইণ্টারভিউর জন্য। পরে চাকরির জন্য আরও তিনশ' দিতে হবে বিজনদাকে। কিন্তু তার জন্য তুই অন্তত দিন সাতেক সময় পাবি।

তিনশ' টাকা? অনেকটা আপন মনেই শ্যামলী বলে। ভাবে মাসের শেষ, কোথায় কার কাছে ধার পাবে সে। বাড়িতে মার কাছে কিছু নেই। একমাত্র ভরসা অসীমদা। কিন্তু তার কাছে সে কোনদিন টাকা পয়সা চায় নি। তাহলেও এ যে স্টেট্ ব্যাংকের চাকরি! সুযোগটা হারালে অসীমই হয়তো তাকে গালাগালি করবে। তাছাড়া সে তো ধার নিচ্ছে। চাকরিটা পেয়ে গেলে দু-এক মাসের মধ্যেই টাকাটা শোধ করে দেবে।

কিন্তু বিমান তো এখন সামতাবেড়ে চলেছে। সে কি কলকাতায় ফিরে যেতে রাজী হবে? আর তার জন্যও মা বাড়িতে বসে আছে। হয়তো না খেয়ে রয়েছে।

থাক্ গে, কলকাতায় ফিরে টাকাটা যোগাড় করে বিমানকে দিয়ে, সে তো সন্ধ্যে নাগাদ আবার ফিরে আসছে।

—তোর কাছে হবে নাকি শ' তিনেক টাকা? বিমান কথা বলে এতক্ষণে।

—না অতটাকা আজ আমি কোথায় পাব।

—এখন কত আছে?

শ্যামলী হাতব্যাগ খোলে, হিসেব করে বলে—তিরিশ টাকার মতো। দেব তোকে?

কি যেন একটু ভাবে বিমান। তারপরে বলে—আচ্ছা পঁচিশটা টাকা আমাকে দে।

শ্যামলী টাকা দেয়। টাকাটা পকেটে রেখে বিমান বলে—বাকিটা কি বাড়ি থেকে দিবি?

শ্যামলী মৃদু হাসে। বলে—বিমান তোর কি? তুই চাকরি করিস না, সংসারের কোন ধার ধারিস না, আজ মাসের ছাব্বিশ তারিখ। যে কোন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের পক্ষে আজ পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করাও দুঃসাধ্য। আমাকে এখুনি কলকাতায় ফিরতে হবে।

—বাড়ি যাবি না?

—না।

—সামনের স্টেশনই কিন্তু দেউলটি!

—তা হোক্ গে। কোলকাতায় গিয়ে টাকাটা তোকে দিয়ে আমি আবার ফিরে আসব। মোটে তো বেলা সাড়ে বারোটা।

তাহলে আমি হাওড়া ষ্টেশনে বড়-ঘড়ির তলায় তোর জন্যে অপেক্ষা করব।

—বেশ।

—কতক্ষণ লাগবে তোর ফিরে আসতে।

—ঘণ্টা চারেক।

—তার মানে সাড়ে চারটে। বেশ আমি সাড়ে চারটে থেকে দাঁড়িয়ে থাকব।

—তুই কি এখন আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাবি?

—না শ্যামলী ! আমি একটা রিক্শা নিয়ে একবার শরৎ-বাবুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। মানে মনটা বড়ই যেতে চাইছে। তুই-নিশ্চিন্ত থাক্, আমি সাড়ে চারটের আগেই হাওড়া ফিরব। তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সোজা চলে যাব ধনপতির বাড়িতে। আজ শনিবার সে ততক্ষণে বাড়ি ফিরে আসবে।

গাড়ির গতি কমছে। দেউলটি আসছে। ওরা দুজনে দরজার কাছে আসে। গাড়ি থামে। ওরা ষ্টেশনে নামে।

টাকা নিয়ে শ্যামলী সাড়ে চারটের আগেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। তবে এবারে সে একা আসে নি। মানে অসীম তাকে একা ছাড়ে নি। সহকর্মী ও বন্ধু রজতকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রজত একসময়ে পাড়ার মস্তান ছিল। এখনও নিয়মিত ব্যায়াম করে।

অসীম টাকাটা যোগাড় করে দিয়েছে বটে, কিন্তু বিমান যে একটা আস্ত প্রতারক, এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ও সে বলেছে—যাচ্ছ বটে, কিন্তু তোমার সখাটিকে আর সেখানে পাচ্ছ না। সে এতক্ষণে তোমার পঁচিশ টাকা নিয়ে কোন মদের দোকানে বসে গিয়েছে।

—তোমার সব ব্যাপারেই এমনি সব উদ্ভট সন্দেহ। শ্যামলী প্রতিবাদ করেছে। বলেছে—চলোই না। গিয়ে দেখবে বিমান আমার পথ চেয়ে আছে।

শেষ পর্যন্ত শ্যামলীর কথাই কিন্তু সত্য হল। সত্যি সত্যি বিমান বড়-ঘড়ির তলায় দাঁড়িয়ে আছে, তারই পথ চেয়ে রয়েছে।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শ্যামলী অস্থির হয়ে পড়ে। নিজের অলক্ষ্যেই চেঁচিয়ে উঠে—বিমান !

—কোথায় ? অসীম জিজ্ঞেস করে।

—ঐ তো। শ্যামলী ইসারা করে দেখায়।

বিমানও দেখতে পায় ওদের।

—সেকি ! ও চলে যাচ্ছে কেন ? এই বিমান কোথায় যাচ্ছিস ?

কিন্তু বিমান তার কথায় কান দেয় না। সে ত্রস্ত পায়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে, বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে।

শ্যামলী আবার ডাকে···বিমান, বিমান···

বিমান দৌড়তে শুরু করেছে।

···শালা পালাচ্ছে! রজত হেঁকে ওঠে। সে-ও ছুটতে শুরু করেছে। অসীম তাকে অনুসরণ করছে।

ওরা চিৎকার করছে···চোর, চোর···ওকে ধরুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ ছেলেটাকে··· চোর···

চোর পালাতে পারে না। বিমান ধরা পড়ে।

রজত গিয়ে তার জামার কলার চেপে ধরে। জামাটা ছিড়ে যায় খানিকটা। কিন্তু রজতের হাত থেকে মুক্তি পায় না বিমান। চারিদিকে ভিড় জমে যায়।

—আমাকে যেতে দিন, প্লিজ আমাকে ভেতরে যেতে দিন। ভিড় ঠেলে শ্যামলী এগিয়ে আসে বিমানের পাশে। রজতের হাত ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—ছেড়ে দিন ওকে!

অপ্রস্তুত রজত তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী দুহাতে বিমানকে কাছে টেনে নেয়। উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে —খবরদার, কেউ ওর গায়ে হাত দেবেন না।

শুধু অসীম আর রজত নয়, উপস্থিত জনতাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

একটু বাদে বিমানকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় শ্যামলী। একবার চারিদিক দেখে নিয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করে—আপনারা কিছু মনে করবেন না, এঁরা ঠাট্টা করে চোর চোর বলে চেঁচাচ্ছিলেন। আসলে ইনি চোর নন, আমাদের বন্ধু। দয়া করে আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন।

জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

কেটে যায় কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ক্লান্তকণ্ঠে শ্যামলী জিজ্ঞেস করে—তুই কেন এমন করলি বিমান?

—আমাকে আপনি পুলিশে দিন।

—না, না, না। তোকে পুলিশে দেব কেন? তুই শুধু সত্যি করে বল, কেন তুই এমন করলি?

বিমান চোখ মোছে। অব্যক্ত স্বরে কোন মতে বলে—আমার যে কোন উপায় ছিল না। ছোটবেলা বাবা মারা গিয়েছেন, মা অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন। সেই মা আজ এক মাসের ওপরে শয্যাশায়ী, পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। মাইনে দিতে পারি নি বলে, ছোট ভাইটাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফি যোগার করতে পারি নি বলে, ছোট বোনটা গতবার হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিতে পারে নি। বি-এস-সি পাশ করে দু' বছর বসে আছি। বহু চেষ্টা করেও কোন চাকরি জোটাতে পারি নি। একটা ট্যুশানি করতাম, সেটাও গেছে এ মাস থেকে। একবার থামে বিমান। তারপর বলে—বিশ্বাস করুন, ভাই-বোন দুটো গতকাল থেকে না খেয়ে আছে। আমি নিজে আজ দুদিন পরে চারটি ভাত খেয়েছি।

—ওর সেই পঁচিশ টাকা ভেঙ্গে বোধহয়? শ্যামলীকে দেখিয়ে রজত প্রশ্ন করে।

বিমান করুণ চোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

—ওসব মামদোবাজি ছাড়ো তো চাঁদ। ভালয় ভালয় টাকা পঁচিশটা বের করে দাও।

—না, না। শ্যামলী প্রায় কেঁদে ওঠে। অসীমের হাত ধরে বলে—ওগো তুমি রজতদাকে নিষেধ করো। শুনছো না, ওর মায়ের খুব অসুখ, ভাই-বোন দুটো কাল থেকে না খেয়ে আছে। তোমার পায়ে পড়ি, বিমানকে ছেড়ে দাও। ও বাড়ি চলে যাক্।

অসীম বিস্মিত হয় না, সে শ্যামলীকে জানে। তাই সে চুপ করে থাকে। কিন্তু রজত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শ্যামলীর দিকে।

শ্যামলী আবার কথা বলে। সে অসীমের হাত ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে আসে বিমানের কাছে। তাকে ধমক লাগায় — দাঁড়িয়ে

রয়েছিস কেন? সেই তো কখন বেরিয়েছিস বাড়ি থেকে। আর দেরি করিস না, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যা।

বিমান অসীম ও রজতের দিকে তাকায়। বোধহয় বুঝতে পারে তারা আর তাকে আটকে রাখবে না। সে চোখ মোছে। ক্ষীণকণ্ঠে শ্যামলীকে বলে—আমি যাই তাহলে?

শ্যামলী মাথা নাড়ে।

বিমান আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে।

শ্যামলী তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কি যেন ভাবে। সহসা বলে ওঠে—বিমান! শোন।

বিমান চলা থামায়। সে শ্যামলীর দিকে ফেরে।

শ্যামলী এগিয়ে যায় বিমানের কাছে। হাতব্যাগ খুলে একখানি একশ' টাকার নোট বের করে। বলে পঁচিশ টাকার অবশিষ্ট দিয়ে মায়ের কি চিকিৎসা করবিরে। নে এই টাকাটা ধর। সে একশ' টাকার নোটটা এগিয়ে ধরে।

—না, না, না! বিমান উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—পাগলামী করিস না! যা বলছি কর, টাকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যা!

কিন্তু বিমানের কান্না থামে না। এবারে অসীম এগিয়ে আসে তার কাছে। বলে—কাঁদছ কেন? টাকাটা নাও। আমরা তো স্বেচ্ছায় দিচ্ছি তোমাকে।

একটু বাদে চোখ মুছে বিমান তাকায় ওদের দিকে। হাত বাড়িয়ে সে টাকাটা নেয়। তারপর ধীরে ধীরে মিশে যায় অগণিত অপরিচিত মানুষের মাঝে। কে জানে ওদের মাঝেও হয়তো তার মতো আরও বহু বিমান রয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামলী তাকায় অসীমের দিকে। তারপর বলে—তোমরা এখন বাড়ি যাবে?

—আমি নয়, রজত বাড়ি যাবে।

—তুমি?

—আমি পানিত্রাস যাচ্ছি।

—না, না। মা কি ভাববেন বলুন তো? শ্যামলী রজতের দিকে তাকায়।

রজত একটু হাসে।

অসীম বলে—যা ইচ্ছে ভাবুক, আজ আমি তোমাকে কিছুতেই একা একা এতটা পথ যেতে দেবো না। তাছাড়া বাড়ি পৌঁছতে তোমার রাত হয়ে যাবে।

—বেশ চলো, কিন্তু একটা কন্‌ডিশান···

—কি?

—আজ তুমি ওখানেই থাকবে। কাল বিকেলে আমরা একসঙ্গে কলকাতায় ফিরব।

—পাগল নাকি। বাড়িতে বলা নেই, দাদা থানায় ডায়েরী করবে।

—করবেন না। রজতদা ফেরার পথে তোমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দেবেন। পারবেন না রজতদা, এই কষ্টটুকু করতে?

—কেন পারব না? রজত তাকে উত্তর দেয়। তারপরে অসীমকে বলে—তুই আজ ওখানেই থেকে যাস্, আমি তোর বাড়িতে খবর দিয়ে দিচ্ছি।···আচ্ছা, আমি চলি তাহলে।

ওরা মাথা নাড়ে। রজত চলে যায়।

—কখন ট্রেন আছে? অসীম জিজ্ঞেস করে।

—চলো, জেনে নেওয়া যাক্।

—হ্যাঁ, চলো। কিন্তু শ্যামলী চলা শুরু করে না। সহসা নত হয়ে সে অসীমকে প্রণাম করে।

অসীম শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

শ্যামলী আবার গাড়িতে উঠেছে আর অবাক্ কাণ্ড এটাও পাঁশকুড়া লোক্যাল।

তবে এবারে শ্যামলী একা নয়। আর গাড়িতে বসে বসে শুধু অসীমের কথা ভাবতে হবে না ওকে। অসীম তো ওর সঙ্গেই রয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

হিমালয়ের প্রধান গিরিশ্রেণীগুলির একটি ধোলাধার। বিপাশা ও ইরাবতী বিধৌত বনাবৃত এই গিরিশ্রেণী কাংড়া জেলায় অবস্থিত। কাংড়া আগে ছিল পাঞ্জাবে, এখন হিমাচল প্রদেশে। ধোলাধারের একপাশে চাম্বা আর একপাশে ধর্মশালা—ভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস।

চিত্রবৎ চাম্বার মতই চিরসুন্দর ধর্মশালা। পাঠানকোট ও মাণ্ডি থেকে বাসে চেপে খুব সহজেই পৌঁছানো যায়। পাঠানকোট থেকে ধর্মশালা ৫৬ ও মাণ্ডি থেকে ৯৬ মাইল। ধর্মশালা থেকে কাংড়া ১১, বৈজনাথ ৪২ ও জ্বালামুখী ৩২ মাইল। প্রত্যেক পথে সারাদিন বাস চলে।

শান্ত সুন্দর ও সুবিশাল শৈলাবাস। দুটি ভাগে বিভক্ত—লোয়ার ও আপার ধর্মশালা। ৪১০০ ফুট থেকে লোয়ার ধর্মশালা শুরু। প্রথমেই সিভিল লাইন্স—শহরের অভিজাত অংশ। তারপরে ৭৫৫০ ফুটে কোতোয়ালী বাজার—মধ্যবিত্তদের নিবাস। আমরা এখানেই বাস থেকে নামলাম। রেস্ট হাউস ও ট্যুরিস্ট হোম এখানেই অবস্থিত।

রেস্ট হাউসটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। বাজারের পাশে একটা টিলার ওপরে অবস্থিত। সামনের লনে বসে সারা ধর্মশালাকে দেখা যায়।

ট্যুরিস্ট হোম একটু দূরে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে এগিয়ে বাঁদিকের চড়াইপথে খানিকটা ওপরে উঠে—ডানদিকে। পাইন বনের ভেতরে বড় বাড়ি। ছোট-বড় অনেকগুলি ঘর। আমরা আগেই চিঠি

দিয়েছিলাম। বড় একখানি ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হল। সঙ্গে ক্যান্টিন আছে। কোন অসুবিধে নেই।

কোতোয়ালী বাজার থেকে আপার ধর্মশালা পাঁচ মাইল। আপার ধর্মশালাও দুটি ভাগে বিভক্ত—ক্যান্টনমেণ্ট ও ম্যাকলিয়ড-গঞ্জ। উচ্চতা ৫০০০ থেকে ৫৭০০ ফুট। সব বাসই ম্যাকলিয়ড-গঞ্জ পর্যন্ত যায়। কাজেই যাতায়াতের কোন অসুবিধে নেই। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম করে আমরাও যাব সেখানে। দর্শন করে আসব বাগশুনাথের মন্দির ও মহামান্য দালাই লামাকে।

ধর্মশালার চারিদিকে আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। যেমন ধর্মকোট (৬৫৬০´) কোতোয়ালী বাজার থেকে ৮ মাইল, ত্রিয়াণ্ড (৯০০০´) ১২ মাইল, ডালহ্রদ (৬০২০´) ৬ মাইল, কাবেরী হ্রদ (৬০০০´) ১৩ মাইল, খানিয়ারা (৪৫০০´) ৪ মাইল, ইয়োল (৪১০০´) ৬ মাইল ও চন্দ্রাদেবীর মন্দির (৪০০০´) ৯ মাইল। যাতায়াতের কোন অসুবিধে নেই।

বেড়াতে বেরিয়ে দিনে বিশ্রাম করা পোষায় না আমাদের। তাই খাওয়ার পরেই পড়লাম বেরিয়ে। এলাম বাসস্ট্যাণ্ডে। একটু বাদেই বাস এলো। মসৃণ ও প্রশস্ত চড়াই পথে বাস চলল।

পথের পাশে খাদ। পাহাড়টা গিয়ে মিশেছে নিচের সমতলে। গাছপালা বাড়ি-ঘর আর ক্ষেত-খামার। দূরে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা। তাদের মাথায় সোনালী মেঘের মুকুট। নীলাকাশের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে তারা।

পাঁচটি পথের সঙ্গমে ম্যাকলিয়ডগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড। কোতোয়ালী বাজার থেকে ৬ মাইল। মিনিট বিশেক বাদে বাস এসে থামল। আমরা বাস থেকে নামলাম।

সামনেই তিব্বতী মন্দির—ইঁটের তৈরি একটি স্তম্ভ। শীর্ষে পেতলের শিখর- কলশ। তিব্বতী মেয়ে-পুরুষ ও শিশুর দল মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। দু-একজন লামাও আসছেন মাঝে মাঝে। তাঁদের হাতে প্রার্থনাচক্র।

পাঁচটি পথের ছুটি এসেছে নিচের থেকে। একটি পায়ে চলা পথ আর একটি মোটর পথ—যে পথে আমরা এসেছি। একটি পথ চলে গেছে শহরে—মল রোড, একটি ট্রিয়াণ্ড ও আর একটি ভাগশুনাথের মন্দিরে। সেই পথে এগিয়ে চলি আমরা।

বনাবৃত ও ঝরণা বিধৌত সুন্দর পাহাড়ী পথ। মাইলখানেক এসে ডানদিকে বাঁক ফিরতেই পথের শেষে মন্দির তোরণ। সামনে একখানি শ্বেতপাথরের ফলক—

'Presented by 10th Bn. 8th Gorkha Rifles. In memory of their stay at Dharamshala–

কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে উঠে এলাম। সামনেই নন্দীমূর্তি। ভক্তদের তেল ও সিঁদুরে চর্চিত। পাথর বলে চেনাই যায় না। মহাদেবের বাহন নন্দীকে প্রদক্ষিণ করে আমরা মন্দির-দ্বারে এলাম। দ্বারের ওপরে সিঁদুর দিয়ে লেখা 'ওঁ'।

পশ্চিমমুখী ছোট শিবমন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে লুক্কায়িত শিবলিঙ্গ। পেছনের দেওয়ালের সঙ্গে কয়েকটি সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল ও ছত্র। দুপাশের দেওয়ালে পেতলের রাধা-কৃষ্ণ জগদ্ধাত্রী আর পাথরের গণেশ ও মহাবীরের মূর্তি।

সশ্রদ্ধ অন্তরে আমরা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করি। মানসী শিবের মাথায় জল ঢালে, ঘণ্টা বাজায়। তার পরে বেরিয়ে আসে মন্দির থেকে। আমি তাকে অনুসরণ করি ট্রাম-বাসের মতো দেবালয়েও যে 'লেডিজ ফার্স্ট'।

মূল-মন্দিরের ডানদিকে ক্ষুদ্রতর আর একটি শিবমন্দির। চারটি শিবলিঙ্গ রয়েছে সেখানে। মন্দিরটি দর্শন করে আমরা বাঁদিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি মন্দিরের পেছনে—ঝরণার তীরে।

মন্দিরের পেছনে পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে একটি জলধারা—পুণ্যধারা। বাঁধানো নালার ভেতর দিয়ে জলধারা এসেছে মন্দিরের পেছনে। সৃষ্টি করেছে একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত। নিচেই কুণ্ড। একটি নয়, দুটি পরম-পবিত্র কুণ্ড।

কয়েকজন পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করছেন। আমরা কুণ্ডের তীরে এসে দাঁড়াই। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি কুণ্ডের ভেতরে। পুণ্যবারি স্পর্শ করি, মানসীর গায়ে ছিটিয়ে দিই। আমরা কি পাপ ধুয়ে ফেলতে চাইছি? কিন্তু কেন? আর কি পাপ বলে কিছু অবশিষ্ট আছে এ সংসারে?

ফিরে এলাম বাসস্ট্যাণ্ডে। এগিয়ে চললাম ট্রিয়াণ্ডের পথে। তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে পরম রমণীয় স্থান ট্রিয়াণ্ড। এখান থেকে ৬ মাইল। ট্রিয়াণ্ডের পথেই মহামান্য দালাই লামার প্রাসাদ ও আজাদ তিব্বত সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিব্বতীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মক্ষেত্র।

মসৃণ ও প্রশস্ত মোটর পথ। আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে। শুনেছি দালাই লামার প্রাসাদ পর্যন্ত এমনি পথ। তারপরে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা। খানিকটা এগিয়েই পথের বাঁদিকে একটু উঁচুতে তারকাটার বেড়া। কোথাও বা পাথরের দেওয়াল। মাঝে মাঝে বন্দুকধারী পুলিস। জনৈক পথচারী জানালেন—এরই ভেতরে দালাই লামার প্রাসাদ ও দপ্তর।

চড়াই পথটি যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে পথের খানিকটা সমতল আর সেখানেই প্রাসাদ তোরণ। আমরা ভেতরে ঢুকতেই একজন পুলিস অফিসার ছুটে এলেন। বললাম—আমরা মহামান্য দালাই লামার দর্শনপ্রার্থী।

—আপনাদের অনুমতিপত্র আছে কি?

—না। কার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়?

—দিল্লীর বৈদেশিক দপ্তর থেকে।

—আমরা তো আনি নি।

—তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

—আমরা যদি দর্শন প্রার্থনা করে তাঁর কাছে আবেদন করি?

—সে আবেদন মঞ্জুর হবে না। দিল্লীর পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। আপনারা কদিন এখানে আছেন ?

—কালই জ্বালামুখী চলে যাব।

—তাহলে আর তাঁকে দর্শন করতে পারবেন না। পরশুদিন মহামান্য লামা তাঁর শিষ্যদের সাপ্তাহিক দর্শনদানের জন্য বাস-স্ট্যাণ্ডের মন্দিরে যাবেন। সে-সময়ে তাঁকে দর্শন করতে পারতেন।

এ যে দেখছি অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি। কিন্তু সত্যই কি তাই ? ঐ মানুষটির প্রাণের মূল্য যে অনেকখানি।

দুঃখিত অন্তরে ফিরে চলি। এত কাছে এসেও বিশ্ববিখ্যাত বিতর্কিত মানুষটিকে দেখতে পেলাম না। যে মানুষটিকে আশ্রয় দেবার জন্য ভারতকে অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। বন্ধু রাষ্ট্র শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

দালাই লামা ভারতের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। ভারত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি। তাই চীন ম্যাকমোহন লাইন অস্বীকার করে ভারত আক্রমণ করেছিল। মার্কসবাদী গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়েও মধ্যযুগীয় বিশ্বাসে পরিচালিত ধর্মান্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ভারত সীমান্তে স্থায়ী উত্তেজনা জীইয়ে রেখেছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও রাসবিহারী বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাই বলে বৃটিশ সরকার তাঁদের দেশ আক্রমণ করেন নি। ভারতের অপরাধ সে চীনের শাসকদের তাঁবেদার হয়ে দালাই লামাকে তাঁদের উপঢৌকন দেয় নি। ঠিকই করেছে। কোন স্বাধীন দেশই এমন তাঁবেদার হতে পারে না।

ফিরে আসি বাসস্ট্যাণ্ডে। একটি তিব্বতী চায়ের দোকানে এসে বসি। ভয়ে ভয়ে চা-য়ের ফরমাস করি। কে জানে কেমন চা জুটবে! তিব্বতীরা আবার চা-য়ে দুধ ও চিনি ব্যবহার করেন না। গরম লিকারে এক ডেলা দেশী মাখন ফেলে দিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে পান করেন।

না। ভারতীয় চা-ই পরিবেশন করেন দোকানী। কথায় কথায় বলেন—আমরাও আজকাল এই চা খাচ্ছি। আপনাদের মাঝে এসেছি। আপনাদের মতো করেই আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে চাইছি।

হিন্দীতেই কথাবার্তা হয়। সুন্দর হিন্দী বলতে শিখেছে ওরা। ভাগ্য বিবর্তনকে মেনে নিয়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এ দেশের মাটিকে নিজের ভিটে ভেবে আমাদের মতো করে নিজেদের গড়ে তুলছে।

তাই তো করবে নামে আলাদা রাষ্ট্র হলেও যুগ যুগ ধরে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক থেকে তিব্বত ছিল ভারতেরই অংশ। বৃটিশ আমলে ভারতীয় মুদ্রা ছিল তিব্বতে বিনিময়ের মাধ্যম। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ তিব্বতের ডাকব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তিব্বতের প্রতিরক্ষা ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের। আমাদেরই অরাজনৈতিক উদারতার সুযোগ নিয়ে চীন তিব্বত দখল করতে পেরেছে। সে যুক্তিতে চীন তিব্বতের ওপর তার দখলদারী কায়েম করেছে, সে যুক্তিতে তিব্বতের ওপর ভারতের অধিকার অনেক বেশি।

তিব্বতীরা আজও আমাদের পরমাত্মীয়। ওরা এদেশে এসে সেই আত্মীয়তারই স্পর্শ লাভ করেছে। যত বিরোধিতাই করুক চীনকে একদিন এই সত্য মেনে নিতে হবে। তিব্বতের মাটি থেকে তাকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। কারণ রাজনৈতিক দখলদারী কখনও রক্তের সম্পর্ককে ধুয়ে ফেলতে পারে না। এবং সাম্রাজ্যবাদ আজকের দুনিয়ায় অচল।

॥ ছয় ॥

'In the distance we see a range of hazy hills. We do not doubt their real existance. But they are shrouded in a blue mystery. And we yearn to penetrate their secrets. Glorious woods, with marvellous birds and beautiful flowers, they must sure contain. And magnificient views we should see over wonderful country ahead. We cannot be content until we have stood upon those hills and seen the other side.'

প্রায় নব্বই বছর আগে বিখ্যাত পর্বতারোহী ও হিমালয় সমীক্ষক স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড তাঁর প্রথম হিমালয় দর্শন প্রসঙ্গে যা লিখে গেছেন, তা সর্বকালের হিমালয় পথিকদের কাছেই পরম সত্য। একুশ বছর বয়সে কুলু মানালী রোতাং ও লাহুল ভ্রমণে এসে হিমালয়ের প্রেমে পড়েছেন স্যার ফ্রান্সিস। তারপরে সারা জীবন ধরেই তাঁকে হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করতে হয়েছে।

কিন্তু স্যার ফ্রান্সিসের কথা নয়, আজ আমি লাহুল উপত্যকার কথা বলতে বসেছি। চন্দ্রা ও ভাগা নদী বিধৌত লাহুল। তবে চন্দ্রার তীরভূমি দিয়েই আমার প্রধান পথ। তাই আমার কাছে সে চন্দ্রাবতী-লাহুল।

লাহুল আমার গল্পের নায়ক আর চন্দ্রা নায়িকা। নায়িকা-সংবাদ দিয়েই এ কাহিনী শুরু করা যাক।

রোতাং গিরিবর্ত্মের অদূরবর্তী বড়ালাচা গিরিবর্ত্ম (১৬,২০০´) থেকে সৃষ্ট হয়েছে লাহুল-প্রিয়া চন্দ্রা। রোতাং গিরিবর্ত্মের পাদদেশে অবস্থিত গ্রামফু গ্রামের পা ছুঁয়ে সে পৌঁচেছে

কোকসার। লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার বাস জংশন। সেখান থেকেও চন্দ্রার পাশ দিয়ে পথ।

কিন্তু পথের কথা পরে হবে। আগে কোকসারের কথা বলে নিই। কোকসার থেকেই যে এ গল্পের শুরু। কারণ আমরা যখন লাহুল গিয়েছিলাম, তখন রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে মোটর চলাচল শুরু হয় নি। আমরা তাই পাঠানকোট থেকে বাসে নূরপুর, কাংড়া, পালামপুর, যোগিন্দরনগর, মাণ্ডি, বজৌরা, কুলু ও মানালী হয়ে রাহালা পৌঁচেছি।

মানালী থেকে রাহালা ৯ মাইল। রাহালার উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল আমাদের পদযাত্রা। পাঁচ মাইলে প্রায় সাত হাজার ফুট চড়াই ভেঙ্গে রোতাং গিরিবর্ত্ম। রোতাংয়ের উচ্চতা ১৩,৪০০ ফুট। আমাদের ঘণ্টা চারেক সময় লেগেছিল। কিছুক্ষণ সেখানকার চায়ের দোকানে বিশ্রাম করে আড়াই মাইল সমতল ও তিন মাইল উৎরাই পেরিয়ে গ্রামফু। তারপরে আরও তিন মাইল প্রায় সমতল পথ পেরিয়ে কোকসার।

তখন প্রত্যেক লাহুল স্পিতির যাত্রীকেই যাওয়া-আসার পথে কোকসারে রাত্রিবাস করতে হোত। কিন্তু ওখানকার ডাকবাংলোয় মোট দু'খানি ঘর। তারও রিজার্ভেশান হয় কেলং থেকে। অনেক আগে চিঠি না লিখলে রিজার্ভেশান পাওয়া অসম্ভব।

ডাকবাংলো ছাড়া কোকসারে আর যে সব আশ্রয় আছে, সেগুলি বাসোপযোগী নয়। তবু নিরাশ্রয় যাত্রীদের সেখানেই রাত্রিবাস করতে হয়। যেমন করতে হয়েছে আমাদের। পথ থেকে নেমে একখানি দোতলা ঘর। নিচের তলায় হোটেল অর্থাৎ ডাল-রুটি তরকারী ও চায়ের দোকান। দোকানে খেলেই বিনামূল্যে দোতলায় আশ্রয় পাওয়া যায়। তবে খাটিয়া নিতে হলে পঞ্চাশ পয়সা করে ভাড়া দিতে হয়। বিছানা মানে নোংরা এবং ছিন্ন লেপ-তোষক। একজোড়া লেপ-তোষকের জন্য এক রাত্রির ভাড়া দু'টাকা।

দোতালায় উঠবার সিঁড়িটি খুবই বিপজ্জনক। খাড়া কাঠের সিঁড়ি। জানালাহীন ঘর—কাঠের মেঝে ও মাটির দেওয়াল। বেশ গরম। পরিবেশ যতই নোংরা হ'ক, আমরা বেশ আরামেই রাত কাটিয়েছি। পরদিন সকালে অবশ্য আমরা ডাকবাংলোতেই ঠাঁই পেয়েছি। বাসের টিকিট না পাওয়ায় দুদিন কোকসারে থাকতে হয়েছে আমাদের। বেশ আনন্দেই কাটিয়েছি।

ছোট একটি রমণীয় উপত্যকা কোকসার। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে চন্দ্রা। চন্দ্রার দু'তীর থেকে ধীরে ধীরে উঠে গেছে উপত্যকা—দূরের পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের মাথায় তুষারের আভাষ। লাহুলের উচ্চতা দশ থেকে এগারো হাজার ফুট। কোকসার ১০,৮০০´ ফুট। সারাদিন প্রচণ্ড বাতাস বয়। তাই ভীষণ ঠাণ্ডা।

গুটি কয়েক দোকান ও হোটেল, নির্মাণ বিভাগের অফিস, কোয়ার্টার্স ও ডাকবাংলো আর মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশানের অফিস এবং বাসস্ট্যাণ্ড নিয়ে কোকসার। সেখান থেকে বাস যায় লাহুল উপত্যকার সদর কেলং ও স্পিতি উপত্যকায়। উপত্যকার শেষে চন্দ্রার ওপরে লোহার পুল। পুলের গোড়ায় পুলিশ পাহারা। নদীর ওপারে উঁচু জমিতে কয়েকখানি ঘর। এই হল কোকসার।

সেই কোকসার থেকে বাস ছাড়ল আমাদের। বাস মানে একটি বড় জীপ। এখন ভাল ও বড় বাস চলাচল করে, তখন চলত জীপ। পেছনে দু'সারি সীট। দশজন বসা যায় কিন্তু তাতে চোদ্দজন বসতে হয়েছে আর নিচে মালের ওপরে ও পেছনের রেলিংয়ের ওপরে বসেছে আরও জন দশেক। পা ছড়ানো দূরে থাক, নড়েচড়ে বসবার উপায় নেই। ড্রাইভারের পাশে চারজন আর ত্রিপলের ছাউনির ওপরে জন ছয়েক।

ড্রাইভারসহ পঁয়ত্রিশজন মানুষকে নিয়ে জীপ কোকসার থেকে রওনা হল কেলং। তখন সকাল সাড়ে সাতটা। বাস স্ট্যাণ্ডটি

অনেক উঁচুতে। আমাদের জীপ আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে নেমে এলো পুলের গোড়ায়। একবার থামতে হলো। পাহারারত পুলিশ একটা কাগজের প্যাকেট দিল ড্রাইভারকে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে পুল পেরিয়ে আমরা চন্দ্রার অপর তীরে এলাম। তারপর আবার চড়াই পথ বেয়ে গাড়ি উঠে এল খানিকটা ওপরে। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। বাঁয়ে অনেক নিচে চন্দ্রা। সেও চলেছে আমাদের সঙ্গে। চলেছে টাণ্ডিতে, ভাগার সঙ্গে মিলিত হতে। চন্দ্রা এবং ভাগা উভয়ের জন্ম হয়েছে একই অঞ্চলে। চন্দ্রা এসেছে এদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূবে আর ভাগা গেছে উত্তর-পশ্চিমে। দুই নদী দু'দিক দিয়ে লাহুল উপত্যকাকে বিধৌত করে টাণ্ডিতে মিলিত হয়েছে; জন্ম নিয়েছে চন্দ্রভাগা—জম্মু-কাশ্মীরকে সুজলা ও সুফলা করে সে চলে গেছে পাকিস্তানে।

পথের ডান দিকে পাহাড়। আর বাঁ দিকে অনেকটা নিচে চন্দ্রা। চন্দ্রার ওপারে পাহাড়— কোথাও কাছে, কোথাও দূরে। সবুজ নয়, ধূসর পাহাড়। বৃক্ষলতাহীন নিরেট পাথরের পাহাড় ও প্রান্তর। রুক্ষ প্রকৃতিই লাহুল স্পিতি উপত্যকার বৈশিষ্ট্য. এই নিরস রূপ দেখার জন্যই আমরা এসেছি ছুটে, আমাদের মতো শত শত পর্যটক প্রতিবছর আসেন এখানে। এ আসা শুরু হয়েছে বহুকাল কিন্তু শেষ হবে না কোনকালে। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি পর্যটকদের প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছে।

লাহুলের রুক্ষতার প্রধান কারণ এখানে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। ফলে ধূলিধূসরিত পথ। বাস থামলেই পথের ধূলোয় চারিদিক ভরে যাচ্ছে। আর পথের বাঁকে মাঝে মাঝেই বাসকে থামতে হচ্ছে! সামনের ও পেছনের পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে না কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্যান্ট সোয়েটার, টুপি ও মুখের রং পালটে গেল। গৈরিক লাহুলের পথে নেমে আমরা গেরুয়া ধারণ করলাম।

আমাদের ডানদিকে পাহাড়, বাঁ দিকে উপত্যকা। নদীর এপারের পাহাড় থেকে ওপারে পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত। নামেই উপত্যকা। প্রকৃতপক্ষে রিক্তা প্রকৃতি—শস্যক্ষেত্র তো দূরের কথা, পাইন কিম্বা দেওদার, জংলা ঝোপ এমন কি শেওলায় সাক্ষাৎ পর্যন্ত মিলছে না। যতদূর দেখা যাচ্ছে পাথর শুধুই পাথর। নানা রঙের পাথর। নানা আকারের পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় সাদা। কোনটিতে বরফ আর কোনটিতে মেঘ জমে আছে।

এই স্থির প্রকৃতির মাঝে চিরচঞ্চলা চন্দ্রা। সে যেন মৃত্যুর মাঝে জীবনের, শূন্যতার মাঝে পূর্ণতার, রিপ্ততার মাঝে বিত্তবতীর প্রতিমূর্তি। তার নীলজলে স্বপ্নের আবেশ। স্বপ্নময়ী চন্দ্রা আমাদের হাতছানি দিয়ে বলছে—এসো, আমার সঙ্গে এসো। লাহুলের এই রিক্ত রূপ এখন তোমার ভাল না লাগলেও, পরে সে তোমার মন ভরিয়ে দেবে।

চল্লিশ মিনিট পরে জীপ স্থির হল। আমরা দশ মাইল এসেছি। এ জায়গাটার নাম শিশু। বেশ বড় গ্রাম। এখানে লাহুল সত্যি সত্যি তার রিক্ততা হারিয়ে ফেলল। কেবল বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট নয়—এখানে রয়েছে ক্ষেত-খামার। রয়েছে মাঝারী ও ছোট ছোট গাছ—উইলো গাছের বন।

কিন্তু শিশুর পর থেকে স্বপ্নময়ী চন্দ্রা সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করেছে। তার নীলজলে গৈরিক ছোঁয়া লেগেছে।

শিশু ছাড়িয়ে আট মাইল এগিয়ে গোন্ধলা। এটিও বেশ বড় একটি গ্রাম। উইলো বন এখানেও আছে। কয়েক বছর আগে এই সব উইলো গাছ লাগানো হয়েছে। গৈরিক লাহুলে সবুজের প্রলেপ দেবার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। বৈরাগী লাহুল সংসারী হয়েছে। অধিকাংশ গাছই এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। একটু বড় বড় গাছগুলির ছাল ছাড়ানো। দরিদ্র লাহুলীরা গ্রীষ্মকালে উইলো গাছের ছাল ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়ে রেখে দেয়। শীতকালে সেই শুকনো ছাল সিদ্ধ করে খায়। খুবই বলদায়ক খাদ্য নাকি!

হতে পারে। ঘাস খেয়ে যখন গরু বাঁচে, তখন ঘাসের মধ্যেও নিশ্চয়ই বলদায়ক বস্তু প্রচুর আছে! কিন্তু ঘাস খেয়ে মানুষের বেঁচে থাকা যেমন নিয়ম নয়, তেমনি উইলো গাছের ছাল খেয়ে জীবন ধারণ করাটাও বোধকরি ব্যতিক্রম।

গোন্ধলায় কিছু কিছু আলু ও খাটুর ক্ষেত আছে। খাটু যবের মতো একরকমের পাহাড়ী শস্য। এ থেকে আটা হয়। এখানে অনেক বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট। রয়েছে নির্মাণ বিভাগের অফিস, কোয়ার্টার্স ও গুদাম। আর রয়েছে একটি ডাকবাংলো।

কিছুদূর এগিয়ে খোরাং—ছোট গ্রাম। পথের নিচে চন্দ্রার তীরে গ্রাম। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে ইলেকট্রিক লাইটের তার। আর চন্দ্রার ওপারে ক্ষেত। তারপরে পাহাড়।

তারপরে আরেও একটি ছোট গ্রাম—দালং। একই রকম অবস্থান।

বেলা সওয়া নটার সময় আমরা টাণ্ডি এলাম। চন্দ্রা ও ভাগার সঙ্গম—চন্দ্রভাগার জন্মস্থান। ডানদিক থেকে ভাগা এসে চন্দ্রার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপর চন্দ্রভাগা বয়ে গেছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দিকে। চন্দ্রভাগার ওপারে সারি সারি পাহাড়। তাদের ওপারে চাম্বা উপত্যকা।

টাণ্ডির পরে চন্দ্রা গেল হারিয়ে, আমরা ভাগার তীর দিয়ে চললাম এগিয়ে। টাণ্ডি থেকে কেলং ৪ মাইল। পথের প্রকৃতি একই রকম। তেমনি একদিকে নদী ও আরেকদিকে পাহাড়। তারই মাঝে ধূলিধূসরিত পথ। তবে পথের দুদিকেই গাছপালা। মাঝে মাঝে ক্ষেত।

এসে গেছি—কেলং দেখা যাচ্ছে।

ভাগা এখানে একটি বড় ঝরণার মতো—নীল ঝরণা। ভাগার ওপরে কাঠের পুল।

বাস চলল শহরের মধ্য দিয়ে—শৈল শহর। ভাগার তীরে পাহাড়ের গায়ে আর উপত্যকায় গড়ে উঠেছে এই শহর—লাহুল

উপত্যকার জেলা সদর। অনেকদিনের জনপদ। মোটর চলাচলের উপযোগী এই একটিমাত্র পথ। পথের দুদিকেই বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট। হোটেল, মুদি ও মনোহারী দোকান। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ডাক ও তার অফিস, ডেপুটি কমিশনার ও নির্মাণ বিভাগের অফিস। তারপরেই বড় ময়দান। এতটুকু শৈলশহরে এত বড় ময়দান খুব বেশি দেখা যায় না।

সেখানে এসেই বাস থামল আমাদের। পুল থেকে এই ময়দান পর্যন্ত শহর।

ডেপুটি কমিশনারের অফিস সবচেয়ে বড়। কিন্তু নির্মাণ বিভাগের অফিস বেশি জমজমাট। লাহুল উপত্যকায় যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে—এই দপ্তর তার যজ্ঞশালা। কাজেই আজকের লাহুলে নির্মাণ বিভাগের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

নির্মাণ বিভাগের দপ্তরের পাশেই নির্মিত হয়েছে নতুন ডাক-বাংলো। বেশ বড় একটি দোতলা বাড়ি। আধুনিক কায়দায় তৈরি। এই ডাকবাংলো নির্মিত হবার পরে পর্যটকদের আশ্রয়ের অভাব ঘুচেছে।

কেলং শহরের তিনদিকেই তুষারাবৃত পাহাড়। তবু এখানে হাওয়া কম, শীত কম। কেলং নাকি লাহুল উপত্যকার উষ্ণতম স্থান। তাই এখানে জেলা সদর করা হয়েছে। অথচ কেলংয়ের উচ্চতা সাড়ে দশ হাজার ফুট। বোধকরি অবস্থানের জন্যই কেলং-এর আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ।

এখানকার মাটি কিন্তু বেশ উর্বরা। অনেকেই বাড়ির সামনে ছোট ছোট ফুল বা ফলের বাগান করেছেন। খুব ভাল আলু কফি শাক-শব্জি হয়েছে। কেবল কেলং কেন, লাহুল-স্পিতি উপত্যকার মাটি অত্যন্ত উর্বরা। কষ্ট করে ক্ষেত তৈরি করতে পারলে এখানে খুবই ভাল ফসল হতে পারে। কিন্তু ক্ষেত তৈরি করার কষ্টটা সবাই স্বীকার করতে রাজি নয়। তবে ইদানীং সরকারী সাহায্যে জমি উদ্ধার করে ক্ষেত তৈরি করা হচ্ছে। অদূর

ভবিষ্যতে হয়ত লাহুল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এখন সে পর-নির্ভর রোতাংয়ের ওপার থেকে খাদ্য না এলে লাহুলকে উপোস করতে হয়।

কেবল খাদ্য নয়, বস্ত্র ও জীবন ধারণের অন্যান্য সমস্ত উপকরণের জন্যই লাহুল আজ পরমুখাপেক্ষী। লাহুলীদের জীবনে উপবাস তাই সাধারণ নিয়ম।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার চেষ্টা চলেছে। কুটির শিল্প গড়ে তুলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। তারই প্রথম পদক্ষেপরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কার্পেট বুনন কেন্দ্র। সেখানে এলাম আমরা। ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরি করে তা দিয়ে কার্পেট বোনা হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর সুন্দর কার্পেট বুনছে। বড় ভাল লাগছে দেখতে। ওদের মুখে ফুটে উঠেছে আগামী দিনের ছবি—আত্মনির্ভরশীল সমৃদ্ধ লাহুলের প্রতিচ্ছবি। শতাব্দীর অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে।

দিন আগত ঐ। ভাবীকালের সেই উদীয়মান নবসূর্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নেব চন্দ্রাবতী-লাহুল থেকে।

॥ সাত ॥

হিমালয় ভারতের। ভারতবাসীর সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্ক সুদীর্ঘ-কালের—মহাভারতের যুগ থেকে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সে যুগেই দুর্গম হিমালয়কে আবিষ্কার করেছিলেন। বিভিন্ন শৃঙ্গ, হিমবাহ উপত্যকা ও জনপদের নাম থেকেই আমরা সে সব আবিষ্কারের প্রমাণ পাই। কিন্তু সেকালের আবিষ্কারকরা তাঁদের আবিষ্কারের কথা ও কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করে যান নি বলে পরবর্তীকালে আমরা হিমালয়কে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ইংরেজরা আবার হিমালয়কে খুঁজে বের করেছেন। সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ বুঝতে পেরেছিলেন, সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে দুর্গম হিমালয়কে জরিপ করতে হবে, তার মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে।

ভাবতে অবাক্ লাগে, আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে আজও সে-সব জায়গায় যেতে আমাদের দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে হয়, কোন সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তাঁরা সে-সব অঞ্চলে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন। ঈশ্বরলাভ কিংবা কোন রোমাঞ্চকর অভিযানের আসক্তি তাঁদের ছিল না, তাঁরা গিয়েছেন নিছক কর্তব্যের প্রয়োজনে। তাঁদের ছিল না আধুনিক মাউন্টেনিয়ারিং বুট, ফেদার জ্যাকেট আর উইণ্ড-প্রুফ। ছিল না হাই-অলটিচ্যুড টেণ্ট্, স্লীপিং-ব্যাগ আর এয়ার-ম্যাট্রেস। পথ ছিল অজানা। তবু তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে কোন রকম কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

কেবল হিমালয় নয়, সুলেমান, হিন্দুকুশ, তিয়েনসান, কুনলুন, কারাকোরাম, অর্থাৎ পামীরগ্রন্থি থেকে যে কটি গিরিশ্রেণী প্রসারিত হয়েছে, তার সব ক'টিতেই কিছু না কিছু সমীক্ষা করা হয়েছে সে

যুগে। যাঁরা সেই সব সমীক্ষার আয়োজন করেছেন, অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দুর্গম পার্বত্যময় অঞ্চলের জরিপ করেছেন, মানচিত্র অঙ্কন করেছেন, তাঁরা উদ্দেশ্যহীন ছিলেন না। সাম্রাজ্য বিস্তার ও সীমান্ত সুরক্ষিত করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শুধু কি সেই কর্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন ?

না। অজানাকে জানা ও দুর্গমের সঙ্গে সখ্যতা করাও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁরা এই সব বিপদসঙ্কুল পথ আবিষ্কার করে গিয়েছেন বলেই, আজ আমরা হিমালয়ে যেতে পারছি। সুতরাং দুর্গম হিমালয় সম্পর্কে কোন কথা বলতে হলে প্রথমেই সেই সব হিমালয়-পথিকৃৎদের প্রণাম জানিয়ে নিতে হবে।

ইংরেজরা আয়োজন করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কেবল তাঁরাই তো এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন নি! সেই দুর্গম পথে প্রতি পদে যাঁরা তাঁদের সাহায্য করেছেন, সেই-সব ভারতীয় সার্ভেয়ার, খালাসী এবং মালবাহকদের অবদানও কিছুমাত্র কম নয়। তাই তাঁরাও আমাদের প্রণম্য।

প্রণম্য এই জন্য যে তাঁরা সাধন-ভজন কিংবা অভিযান করতে হিমালয়ে যান নি। সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্যও তাঁদের কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়, কারণ তাঁরা তখন পরাধীন ভারতের নাগরিক। তাঁরা গিয়েছিলেন চাকরি করতে, দিন-মজুরী খাটতে।

আজ স্বাধীন ভারতের ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় ও অফিস-আদালতে যখন কাজ না-করাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তাঁদের কথা স্মরণ করার যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা, রীতিমত ভেবে দেখবার বিষয়। তাহলেও তাঁদেরই একজনের কথা বলবার জন্য আমি আজ কলম নিয়ে বসেছি। বসেছি এই জন্য যে তাঁর পুণ্যস্মৃতি হয়তো আমাদের মৃতপ্রায় কর্তব্যজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ সজীব করে তুলতে পারে।

সেই কর্তব্যপরায়ণ কর্মীটির নাম ফজল এলাহি। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মাউণ্টেন সার্ভেয়ার। ১৯৩৫-৩৬ সালে মেজর গর্ডন অসমাস্টোনের নেতৃত্বে যখন গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চল জরিপ করা হয়, তখন ফজল এলাহি সেই দলে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে সেই জরিপের পরে অসমাস্টোন যে মানচিত্র (half-inch surveys) অঙ্কন করান, তা আজও গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানচিত্র।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম—১৯৩৬ সালে ফজল এলাহি অসমাস্টোনের দলে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চল জরিপ করতে গিয়েছিলেন। মূল গঙ্গোত্রী হিমবাহ জরিপ করবার কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি যখন গোমুখী থেকে পনেরো মাইল ওপরে হিমবাহের শেষপ্রান্ত জরিপ করতে ব্যস্ত, তখন অতর্কিতে বর্ষার আগমন ঘটল। শুরু হয়ে গেল প্রবল ঝড় ও প্রচণ্ড তুষারপাত। এমনটি হওয়া উচিত ছিল না, কারণ হিসেব মতো তখনও বর্ষার বেশ দেরি ছিল। কিন্তু হিমালয় হিসেবের ধার ধারে না। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সেবারে অতর্কিতে বর্ষা নেমে গেল।

অপ্রস্তুত ফজল তুষারান্ধ (snow-blind) হয়ে গেলেন। তাঁদের খাবার ফুরিয়ে গেল। তুষারপাতের জন্য গোমুখী থেকে মালবাহকরা জ্বালানীকাঠ নিয়ে পৌঁছতে পারল না। ফলে বরফ গলিয়ে জল তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ফজলকে জরিপকার্য বন্ধ করে দিতে হল।

দৃষ্টিশক্তি খানিকটা ফিরে আসতেই ফজল প্রত্যাবর্তন শুরু করলেন। চারজন খালাসী ছিল তাঁর সঙ্গে। প্রত্যেকের সম্বল দু'খানি করে কম্বল। অভুক্ত অবস্থায় কোমর-সমান তুষারের কাদা ভেঙ্গে তাঁরা নেমে চললেন মূল-শিবিরের দিকে।

তুষারবৃত হিমবাহের ওপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে কোনমতে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সকালে উঠে দেখেন, তাঁরা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছেন—দুখানি কম্বল বয়ে নিয়ে যাবার মতো শক্তি

নেই দেহে। সেখানেই একখানি কম্বল ফেলে রেখে আরেকখানি কাঁধে নিয়ে তাঁরা কোনমতে এগিয়ে চললেন।

অভুক্ত ও শ্রান্তদেহে সারাদিন সংগ্রাম করে তাঁরা দ্বিতীয়দিনে মাত্র সাড়ে তিন মাইল তুষারাবৃত দুর্গম পথ পাড়ি দিতে সমর্থ হলেন। সেদিন তাঁরা শুধু একখানি কম্বল মুড়ি দিয়ে বরফের ওপরে রাত কাটালেন।

পরদিন সকালে দেখেন সেই একখানি কম্বল বইবার শক্তিও নেই দেহে। দুর্বলতায় পা দুখানি ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। খালাসীরা আর চলতে চান না—সেখানেই তার শেষনিশ্বাস ফেলতে চান। ফজল দুর্বল কণ্ঠে তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেন, তাদের আশার বাণী শোনান।

অনেক বলা-কওয়ার পরে খালাসীরা উঠে দাঁড়ান। কম্বল ফেলে রেখে নিজ নিজ দেহখানি বয়ে নিয়ে তাঁরা টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চলেন। প্রচণ্ড শীত আর তুষারপাতের ভেতরে তাঁরা কোনমতে এগোতে থাকেন। কোথায়, তা কিন্তু জানতেন না তাঁরা।

পথ ফুরোয় না কিন্তু দিন ফুরিয়ে আসে। ফজল বুঝতে পারেন, সে-রাতও তাদের হিমবাহের ওপরেই কাটাতে হবে। তিনদিনের অভুক্ত দেহে কম্বল ছাড়া সেই তুষারাবৃত মৃত্যুশীতল প্রান্তরে রাত কাটানো আর মৃত্যুবরণ করা যে একই কথা, তাও বুঝতে পারলেন তিনি। সুতরাং সার্ভেয়ার ফজল এলাহি সঙ্গীদের সঙ্গে জীবনের শেষরাতকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ফজল কিন্তু তাঁর জরিপের কাগজপত্র ফেলে দেন নি। কর্তব্যপরায়ণ সার্ভেয়ার মরণের মুখেও সরকারী কাগজপত্রকে যক্ষের মতো আগলে রাখলেন।

সহসা, কিছুদূরে একটা আলো দেখা যায়।

আলো! চমকে ওঠেন তাঁরা।

একি আলো না আলেয়া?

না। আলো, তাদের জীবনের আলো। শুধু আলো নয়, আলোর সঙ্গে ভেসে আসছে আহ্বান—মনুষ্যহীন প্রান্তরে মানুষের

কণ্ঠস্বর। কেউ বা কারা তাঁরই নাম ধরে ডাকছেন। হিমালয়ের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সেই মধুর আহ্বান ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

ওঁরা সাড়া দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু ওঁরা যে কথা বলতে পারছেন না। তবু চেষ্টা করেন। অনেক কষ্টে গলা দিয়ে খানিকটা শব্দ বের হয়। কিন্তু সে শব্দ তারা শুনতে পেয়েছেন কি?

পেয়েছেন। নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন। নইলে আলোটা এইদিকে এগিয়ে আসছে কেন? তাদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হচ্ছে কেন।

হ্যা, উদ্ধারকারীরা এগিয়ে আসছেন। ওঁরা আবার সাড়া দিতে চান। এবারে সাড়া জাগে। তাঁরা আবার ডাক দেন।

ওঁরা আবার সাড়া দেন।

তাঁরা ছুটে আসছেন ওঁদেব দিকে। কাছে, আরও কাছে।

তাঁরা আসেন। আকুল আগ্রহে জড়িয়ে ধরেন ওঁদের—আলিঙ্গন করেন। ওঁরা কেঁদে ফেলেন। মৃত্যুর দুয়ার থেকে জীবনের তোরণে ফিরে আসার আনন্দ-ক্রন্দন।

অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে খাবার পানীয় ছিল। তিন দিনের আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটালেন ফজল ও তাঁর সঙ্গীরা। তিনদিন পরে খাবার মুখে দিলেন কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীরা।

তখন ওঁদের প্রত্যেকেব পায়েই তুষারক্ষত (frost-bite) দেখা দিয়েছে। তবু ফজল পায়ে হেঁটেই শিবিরে ফিরলেন। তিনজন খালাসীকে কিন্তু পিঠে করে নামাতে হল। শিবিরে পৌঁছে জুতো কেটে তাদের পা খুলতে হল।

কর্তব্যপরায়ণ সার্ভেয়ার ফজল এলাহি সম্পর্কে বিখ্যাত হিমালয় বিশারদ কেনেথ মেসন বলেছেন—'Fazal Elahi with the highest courage brought in his plane-table survey.'

সেদিন তাঁর মতো সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী না থাকলে, আজও হিমালয় আমাদের কাছে অজানাই রয়ে যেত।

এবং ফজল এলাহিরা বিদায় নিয়েছেন বলেই বিগত সাতাশ বছরে হিমালয়ের কোন ভাল মানচিত্র অঙ্কিত হয় নি।

॥ আর্ত ॥

মানুষ আশা করে ভগবান বাদ সাধেন।

মানুষ আশাবাদী। আশায় অধীর হওয়া তার বেঁচে থাকার রসদ, তার জন্মগত অধিকার। কিন্তু মানুষের ভগবান হামেশাই মানুষকে তার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন।

এই চিরন্তন সত্যটা সংসারে সবারই জানা। কিন্তু গতবারে হিমালয়ে গিয়ে আমি সেই চিরকালীন সত্যটিকে যেমন নিষ্ঠুর ভাবে জেনে এসেছি, তেমন ভাবে জানবার দুর্ভাগ্য আর কারও হয়েছে বলে জানা নেই আমার।

গতবার আমরা গিয়েছিলাম গাড়োয়ালের তমসা উপত্যকায়। উপত্যকাটি গিরিতীর্থ-যমুনোত্রীর উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বান্দর-পূঁছ ও স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গমালা থেকে নির্গত হয়ে তমসা দেরাদুন জেলায় এসে যমুনায় মিশেছে।

আমাদের আশা ছিল তমসার তীর ধরে পৌঁছব বান্দরপূঁছ গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত ১৮,৪০০ ফুট উঁচু ধূমধার-কান্দি গিরিবর্ত্মে। সেই দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে গঙ্গোত্রী পথের হরশিলে নেমে যাব। অর্থাৎ তমসা উপত্যকা থেকে ভাগীরথী উপত্যকায় উপনীত হব।

পারি নি। প্রবল তুষারপাত তুষার-গহ্বরের জন্য গিরিবর্ত্মের মাত্র শ'খানেক ফুট নিচের থেকে ফিরে আসতে হয়েছে আমাদের কিন্তু সেই আশাভঙ্গের ইতিহাস এ কাহিনীর বিষয়বস্তু নয়। হিমালয় অভিযানে বেরিয়ে ব্যর্থতার জন্য হাহাকার করার নিয়ম নেই।

আশাভঙ্গ হয়েছে আরেকজনের। নিষ্ঠুর ভগবান তার জীবনের মধুরতম স্বপ্নটিকে ভেঙে দিয়েছে সারা জীবনের মতো। সেই করুণ-কাহিনী বলবার জন্যই আমি আজ কলম নিয়ে বসেছি।

তমসা উপত্যকার শেষ গ্রাম ওসলা—উচ্চতা ন' হাজার ফুট; সেখান থেকেই ধুমধার-কান্দির পথ। ওসলায় রয়েছে বনবিভাগের বিশ্রামগৃহ আর দুর্যোধনের মন্দির। উচ্চ-তমসা উপত্যকার অধিবাসীরা কর্ণ ও দুর্যোধনের ভক্ত। তাদের সমাজে আজও বহুপতি প্রথা প্রচলিত। বড়ভাই বিয়ে করে নিয়ে আসে, ছোটভাইরাও স্বামীত্বের অধিকার পায়। ছেলে-মেয়েরা সব ভাইয়ের সন্তান. তাদের একজন মা, কিন্তু কয়েকজন বাবা।

ওদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও সংসারে মায়ের প্রভাব বেশি। তাকে কেন্দ্র করেই যে সংসারের রথচক্র আবর্তিত হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে সেখানে মেয়েদের মূল্য বেশি। বরপণ নয়, কনেপণ। বেশ কিছু টাকা মেয়ের মাকে দিয়ে তবে তার মেয়েকে ঘরে আনা যায়। টাকাটা অবশ্য সব ভাইরা মিলেই যোগাড় করে। বড়ভাই বিয়ে করতে পারলে যে তাদেরও বিয়ে করা হয়ে গেল।

ভালোবাসা মনের কোনে আপনা থেকেই বাসা বাঁধে। এজন্য কোন বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা ও অবস্থার দরকার হয় না। প্রত্যেক মানুষের মনেই ভালোবাসা থাকে। উত্তরমেরু থেকে সাহারা পর্যন্ত সর্বত্রই ভালোবাসা রয়েছে। তাই তমসা উপত্যকার মানুষরাও প্রেমে পড়ে, তাদের জীবনেও মিলন এবং বিরহ আসে। তবে সেখানে মিলনের চেয়ে বিরহটাই বেশি। বড়ভাই ছাড়া আর কেউ প্রেমে পড়লে যে সে-প্রেম ব্যর্থ হতে বাধ্য। সবার ওপরে রয়েছে কনেপণের বাধা। প্রেম যতই গভীর হোক্ মেয়ের। মাকে পণের টাকা গুনে না দিতে পারলে প্রেমিকাকে ঘরে আনা যায় না। 'ইলোপ্'-য়ের তেমন প্রচলন নেই তমসা উপত্যকায়। সুতরাং ওরা যাকে ভালোবাসে, তাকে বড় একটা বিয়ে করতে পারে না।

আমার নায়ক সোনা সিং কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে

চেয়েছিল। ওরা তিন ভাই, সোনা সবার ছোট। বড়দা বিয়ে করে বউ ঘরে নিয়ে আসার পরেই সে সুযোগ মতো একদিন বউকে বলে দিয়েছিল—তুমি কিন্তু চিরকাল বৌদি হয়েই থাকবে, কখনও আমার বউ হবে না।

কথাটা বিশ্বাস করে নি নতুন বউ। এমন কথা বিশ্বাস করলে ওদের সমাজে সবাই যে তাকে পাগল বলবে। তাই সে মুচকি হেসে সোনার একখানি হাত ধরে সোহাগভরা স্বরে বলেছে—সেকি গো! আমাকে বউ হতে না দিলে যে সারাজীবন তোমাকে বউ ছাড়া কাটাতে হবে।

—তা কেন? সোনা বলেছে—আমি বিয়ে করব আর সে বউ শুধু আমারই বউ হবে।

তির্যক দৃষ্টি হেনে নতুন বউ কৌতুকভরা স্বরে প্রশ্ন করেছে—সে কে?

—চামেলি।

—তুমি বুঝি তাকে ভালোবাসো?

—হ্যাঁ।

—সে?

—সে-ও ভালোবাসে আমাকে। আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না সে।

বউ আবার হেসেছে। সে-ও সুন্দরী যুবতী, বিয়ের আগে সে-ও তার বাল্যপ্রণয়ীদের এ-সব কথা বলেছে। কিন্তু পরে পণের টাকা পেয়ে মা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, সে সানন্দে তার ঘরনী হয়ে এসেছে।

তাহলেও বউ সেদিন সোনার কথার কোন প্রতিবাদ করে নি। শুধু মনে মনে ঠিক করেছে, আস্তে আস্তে সোনাকে কবজা করতে হবে। কেন পারবে না? সে যে চামেলির চেয়ে সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। তাছাড়া সোনা কোথা থেকে চামেলির মায়ের দাবি মেটাবে? চারশ' টাকা না পেলে চামেলির মা মেয়ে দেবে না।

আর বউ সেটা চায়ও নি। সে এই গাঁয়েরই মেয়ে। সোনা

তার সমবয়সী। সোনা তার অন্য স্বামীদের চেয়ে স্বাস্থ্যবান ও রূপবান। সোনার সঙ্গলাভের বাসনা তার বহুদিনের।

কিন্তু বউ-য়ের সে বাসনা পূর্ণ হয় নি। ক্ষেতে খামারে, মেলা ও মন্দিরে যখনই সে সোনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, সোনা তখনই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

অবশেষে তার ধৈর্যের বাঁধ গিয়েছে ভেঙে। আর সে সামলাতে পারে নি নিজেকে। একদিন গভীর রাতে বউ সোনার বিছানায় এসেছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সোনার মুখখানিকে নিজের উন্মুক্ত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে।

তবু সোনা সেই উন্মত্ত যৌবনের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি।

জোর করেই নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বউ-য়ের দুখানি পা জড়িয়ে ধরেছে। তারপরে আকুল কণ্ঠে বলেছে—তুমি আমাকে ক্ষমা করো বৌদি। তোমার তো দু'জন স্বামী আছেন। তুমি তাদের নিয়ে সুখী হও। আমাকে তুমি তোমার ভাই হয়ে থাকতে দাও।

কামাতুরা রমণীর মোহভঙ্গ হয়েছে। কোনমতে সোনার হাত থেকে নিজের পা-দুখানি ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে পালিয়েছে পাশের ঘরে। কয়েকদিন আর মুখ তুলে তাকাতে পারে নি সোনার দিকে। তারপরে আস্তে আস্তে তার লজ্জা কেটে গিয়েছে। সে সোনাকে ভাই বলেই ভাবতে শুরু করেছে।

এখন বৌদি সোনার সবচেয়ে বড় সহায়, তার প্রধান পরামর্শদাত্রী। গত দু'বছর ক্ষেতে-খামারে ও পথে-প্রান্তরে প্রাণপাত পরিশ্রম করে সোনা তিনশ' টাকা জোগাড় করেছে।

সে টাকাও তার বৌদির কাছে।

শুধু তাই নয়, দাদাদের কাছ থেকে বৌদি তার বিয়ের অনুমতি আদায় করেছে। এবং চামেলি বাড়িতে এলে দাদারা কখনও তার ওপরে স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন না, এমন একটা প্রতিশ্রুতিও তাঁরা দিয়েছেন।

এদিকে প্রতিবেশী ভজন সিং চারশ' টাকা নিয়ে চামেলির মা-কে সাধাসাধি করছে। কিন্তু সেদিন বৌদি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছে। তিনি সোনার জন্য এ-মাসটা অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছেন। সুতরাং সোনাকে এখন শুধু একশ'টি টাকা জোগাড় করতে হবে। একশ' টাকা হলেই তার জীবনের মধুরতম স্বপনটি সত্য হয়ে উঠবে।

সেই সুযোগই সোনা পেয়ে গেল আমরা ওসলা পৌঁছবার পরে। আমরা ধুমধার-কান্দি যাবো, কিন্তু পথ চিনি না। তমসা উপত্যকার কোন মানচিত্র ছিল না আমাদের সঙ্গে। থাকবে কেমন করে? কর্তৃপক্ষ যে সেগুলিকে নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। কেন তা তাঁরাই জানেন। কারণ তমসা উপত্যকা কোন সীমান্ত নয়।

অচেনা পথ বলে ওসলা থেকে আমাদের দু'জন পথপ্রদর্শক নিতে হল। সোনা ছিল তাদেরই একজন। সে আগের বছর ধুমধার পেরিয়ে হরশিল গিয়েছে এবং এই পথেই ওসলা ফিরে এসেছে। প্রথম দর্শনেই আমি তাকে ভালোবেসে ফেললাম। একমাথা কালো চুল। কচি কোমল একখানি মুখ। দেখলে মায়া হয়। টানা-টানা দুটি চোখ, উঁচু নাক। দুধে আলতায় গায়ের রং। স্বাস্থ্যবান ও রূপবান যুবক তার ওপরে চমৎকার স্বভাবটি। এমন মানুষকে ভালোবাসব না কেন?

তার পরনে ঘরে তৈরি কম্বলের কোট-প্যান্ট। মাথায় গাড়োয়ালী টুপি। পায়ে আমাদের দেওয়া হান্টার-শু। পিঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা একখানি কম্বল। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। একখানি কম্বল সম্বল করেই সে সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে চলেছে!

আমাদের হাতে আইস-এক্স, কুলিদের হাতে লাঠি। কিন্তু সোনা নিয়েছে ছোট একখানি কুড়ুল। ওসলা থেকে ধুমধারের পথ প্রথম দিকে ঘন বনময়। তাই পদযাত্রা আরম্ভ হবার পর থেকেই সে সবার আগে পথ চলছিল আর কুড়ুল দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল।

রাতে তাঁবুতে বসেও সোনা আমাদের যথাসাধ্য সেবা করত। কারও রুকস্যাক্ থেকে গরম জামা নামিয়ে দিত, কারও এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলিয়ে দিত, কারও বা হাত-পা কিংবা মাথা টিপে দিত। কোন কাজেই কখনও শ্রান্তি ছিল না তার।

পদযাত্রার তৃতীয়দিন সকাল থেকেই শুরু হল তুষারপাত, সেই সঙ্গে প্রবল বাতাস। আমরা তারই ভেতরে এগিয়ে চললাম। সোনা সর্বদা সবাইকে পথ-চলায় সাহায্য করত। কোমর-সমান বরফে পথ চলেও সে ক্লান্ত হত না। সবসময়েই গুনগুন করে গান গাইত। মনে হত যেন সে ঢাকুরিয়া লেকে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

চতুর্থদিন সকালে একটা তুষারাবৃত গিরিশিরা পেরুবার সময় আমি পা ফসকে পাশে পড়ে গেলাম। জায়গাটা দুর্গম হলেও বিপজ্জনক ছিল না। গাড়িয়ে খানিকটা নিচে পড়েই নরম তুষারের পাঁকে আটকে গেলাম। শেরপারা পথ তৈরি করতে করতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

সহযাত্রীরা সকলেই শ্রান্ত। তাদের কারও পক্ষে আমার সাহায্যে নেমে আসা সম্ভব ছিল না। অথচ বহুবার চেষ্টা করেও আমি উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। আইস-এক্স কোন কাজে আসছিল না। চারিদিকে কোমল তুষার কিছুতেই তার ভেতর থেকে পা তুলতে পারছিলাম না। একে তো উচ্চ-হিমালয়ে একটু পরিশ্রম করলেই দম ফুরিয়ে যায়। তার ওপরে বেশি জোর করতেও সাহস হচ্ছিল না। এমনিতেই কোমর সমান তুষারের পাঁক। বেশি জোরাজুরি করলে পাছে একেবারে তলিয়ে যাই।

আমার যখন এমনি অসহায় অবস্থা, তখন সহসা দেখি সেই তুষারের কাদা ভেঙ্গে একজন লোক অক্লেশে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কাছে এলে চিনতে পারি তাকে। সে আর কেউ নয়, আমাদের পথ-প্রদর্শক সোনা সিং।

সেদিন সেই তুষারক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে সোনা আমাকে নিয়ে এলো ওপরে। তারপর থেকে সারাটা পথ সে আমার

পাশে পাশে রয়েছে। আর কিছুক্ষণ বাদে বাদেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে—সাব্, কুছ তকলীফ নহী হ্যায় তো?

ভাবখানা, আমার কিছুমাত্র তকলীফ হলেই সে আমাকে কাঁধে তুলে নেবে।

সেদিনই সোনা আমাকে বলেছে তার জীবন-কাহিনী—ওর মা বাবা বৌদি ও চামেলির কথা। বলেছে—সাব্ জানি না আপনাদের সঙ্গে আমার আর কদিন থাকতে হবে। তবে দয়া করে আপনারা আমাকে অন্তত দশদিন সঙ্গে রাখবেন।

—কেন বলো তো? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছি।

সোনা উত্তর দিয়েছে—সাব্, আপনারা আমাকে দৈনিক দশ রূপেয়া করে তলব দেবেন বলেছেন। আমাকে যে একশ রূপেয়া জোগাড় করতেই হবে। তাই তো মা বাবা দাদা বৌদি ও চামেলির নিষেধ না শুনে আমি আপনাদের সঙ্গে বরফে এসেছি। বিপদকে ভয় করে ঘরে বসে থাকলে কে আমাকে একশ' রূপেয়া দেবে? অথচ এই মাসের মধ্যে চারশ রূপেয়া ওর মাকে না দিতে পারলে, ভজন ওকে নিয়ে যাবে সাদি করে। ভজন ও তার ভাইরা যে রূপেয়া নিয়ে চামেলির মাকে সাধাসাধি করছে। ওর ওপর তাদের নজর বহুদিনের। শুধু আমার বৌদি ওর মাকে বলে কয়েকদিন সময় নিয়েছে বলেই ভজনরা এখনও চামেলিকে নিয়ে যেতে পারে নি।

আগেই বলেছি শেষ পর্যন্ত আমাদের সে অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। প্রবল তুষার ঝড়ের ভেতরেও আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম ধুমধারের পাদদেশ পর্যন্ত। কিন্তু সেখানে অসংখ্য ফাটল থাকায় আর এগোতে পারি নি। কোন রকমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি।

যে তুষার সমুদ্র অতিক্রম করে আমরা ধুমধার-কান্দি গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত গিয়েছিলাম, সেই তুষার সমুদ্র পেরিয়েই ফিরে আসতে হচ্ছিল। তখন আমাদের শারীরিক শক্তি প্রায় নিঃশেষিত। তবু

জলকষ্ট ও শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে আসছিলাম। অভুক্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় ও দু-তিন দিনের পথ একদিনে পার হচ্ছিলাম।

সেবারে আমরা ছিলাম উনিশ জন সদস্য। কিন্তু আমাদের মাত্র দশজোড়া ক্লাইম্বিং বুট ছিল। আমরা বাকি সদস্যরা হাণ্টার-শু পরেই বরফ ভাঙছিলাম। হাণ্টার-শু বরফে একেবারেই অচল। কিছুক্ষণ পথ-চলার পরেই ভিজে যায়। এবং রোদ না থাকায় ভেজা জুতো আর শুকানো সম্ভব হয় না। কাজেই তুষারক্ষতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমরা প্রতিদিন পদযাত্রায় শেষে তাঁবুতে ঢুকেই দু'পায়ের পরিচর্যা করতাম।

সোনা কিন্তু সে-সব নিয়ম-কানুন মানত না। কেনই বা মানবে? ওরা ঘরে তৈরি জুতো পরে বরফ ভাঙে. সেখানে আমরা ওকে নতুন হাণ্টার দিয়েছি। সুতরাং সে একেবারে বে-পরোয়া হয়ে উঠেছিল। কিছু বললে হাসতে হাসতে উত্তর দিত —সাব্, আমরা বরফে জন্মাই, বরফে মারা যাই। বরফ আমাদের চিরসাথী। সে আমাদের কোন ক্ষতি করে না।

নামার পথে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আমরা যেখানে তাবু ফেলেছিলাম, তার কাছেই একটা ঝোঁপড়া বা পাথরের কুঁড়ে ছিল। গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের ঐ সব অঞ্চলে প্রচুর ঘাস ও ছোট-বড় ফুলগাছ জন্মায়। শত শত ভেড়া নিয়ে দলে দলে মেষপালক তখন ওখানে গিয়ে কয়েকটা মাস কাটিয়ে আসে। তারা পাথর দিয়ে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে রাত্রিবাস করে। তেমনি একটা ঘর ছিল সেখানে। বলাবাহুল্য সে জায়গাটাও তখন ছিল তুষারাবৃত। এবং আমরা যখন সেখানে পৌছলাম. তখনও তুষারপাত চলেছে।

সোনা কিন্তু সেখানে পৌছেই বলে বসল—সাব. আমরা আজ রাতে ঐ ঝোঁপড়ায় থাকব।

একটু অবাক হলাম। ওরা, মানে সোনা ও তার সহযোগী

পথ-প্রদর্শক ওসলার থেকে রওনা হবার পর থেকে আমাদের তাঁবুতে রাত কাটাচ্ছিল। হঠাৎ সে ঐ পাথরের কুঁড়েতে থাকতে চাইছে কেন ? পরে বুঝেছি, সেদিন দুষ্টবুদ্ধি ভর করেছিল সোনার ওপরে। কিন্তু তখন তাকে আমরা কেউ বাধা দিই নি। ভেবেছি, হয়তো ওদের তাঁবুতে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেদিন ওরা সেই পাথরের কুঁড়েতে চলে গেল। ওদের সেই চলে-যাওয়াকে আমরা কোন গুরুত্ব দিই নি। কারণ নিষ্ঠুর ভগবানের মনের ইচ্ছা যে জানা ছিল না আমাদের।

যথারীতি রাতে প্রেসার-কুকারে খিচুড়ি রান্না হল। কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পরেও সোনা এবং তার সহযোগী খেতে এলো না। আমাদের তাঁবু থেকে ওদের ঘরটির দূরত্ব সামান্য। কিন্তু চারিদিকেই কোমর-সমান কোমল তুষার এবং তখনও তুষারপাত চলছে। কে বেরিয়ে গিয়ে ওদের খাবার দিয়ে আসবে ?

অথচ সেই অবস্থায় তাদের যে ঐ গরম খিচুরিটুকু খাওয়া একান্তই দরকার, সে সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ তুষারাবৃত অঞ্চলে গরম খাদ্য এবং পানীয় শুধু পেট ভরাবার উপকরণ নয়, তুষার-ক্ষতের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার একটি শ্রেষ্ঠ সম্বল। গরম খাবার শরীরকে গরম করে তোলে, রক্ত চলাচলে সাহায্য করে।

যেখানে প্রচণ্ড শীত ও প্রবল হাওয়া, সেখানে শরীরের উত্তাপ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। দেহের শিরাগুলি সংকুচিত হয়ে মোমের মতো শক্ত হয়ে যায়। ফলে শরীরের যে অঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত কিংবা বরফের কাছাকাছি থাকে, সেই অঙ্গগুলি বিশেষ করে নাক কান ও পায়ে রক্ত চলা-চল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখন রোগী টেরই পায় না। পাবে কেমন করে ? আক্রান্ত অঙ্গে যে কোন বোধশক্তি থাকে না।

রক্ত চলা-চল বন্ধ হয়ে যাবার ফলে শরীরের সেই অংশটি কুঁচকে প্রথমে লাল ও পরে কালো হয়ে যায়। সেখানে আলসার

বা গ্যাংগ্রীন হয় অর্থাৎ জায়গাটি একেবারেই পচে যায়। তখন সেটিকে কেটে ফেলা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

কাজেই তুষারাবৃত অঞ্চলে অভিযাত্রীদের যেভাবেই হোক্ প্রতিদিন কিছু গরম খাদ্য কিংবা পানীয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সোনা এ-সব নিয়ম মানার পক্ষপাতী নয়। সে যে বরফে জন্মেছে, বরফেই শেষ নিঃশ্বাস নেবে। বরফ তার জনম-মরণের সাথী।

পরদিন সকালে যাত্রার আয়োজন শুরু হল। কিন্তু সোনার দেখা নেই। অথচ সকালে সে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে কুলিদের ঘুম ভাঙায়, তাদের মাল বাঁধায় সাহায্য করে।

একে একে কুলিরা মাল নিয়ে রওনা হয়ে গেল, সোনা এলো না। আমরা ব্রেক-ফাস্ট খেতে শুরু করলাম, সোনা এলো না। শেরপা পাচক কামি তাকে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করল, সোনা এলো না।

শেরপা দোরজিকে বলি হয়তো শীতের জন্য সারারাত জেগে কাটিয়ে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি ওদের ডেকে নিয়ে আসো।

দোরজি ফিরে এসে বলল—ঝোঁপড়ামে কোই নহী হ্যায় সাব্। মালুম ও আদমী চলা গিয়া।

—চলা গিয়া। বিস্মিত হই। কোথাও চলে গেল? কেনই বা গেল? কাল রাতেও যে কিছু খায় নি ওরা। তাছাড়া ওরা আমাদের পথ-প্রদর্শক, ওরা থাকবে আমাদের সঙ্গে। নইলে আমরাই বা ওদের মজুরি দেব কেন? ওসলায় ওদের নিয়োগ করবার পরে সেদিন ছিল সপ্তম দিন। সোনা আমাকে অনুরোধ করেছিল, ওকে যেন আমরা অন্তত দশদিন সঙ্গে রাখি। অথচ সে সপ্তমদিনেই পালিয়ে গেল! ওর তো একশ' টাকা দরকার! তাহলে সত্তর টাকা রোজগার করেই সে চলে গেল কেন? সে টাকাও না নিয়েই চলে গেল!

তবে কি ওরা আমাদের কোন মাল-পত্র চুরি করে পালিয়েছে? হতে পারে। কিন্তু কি নিয়ে গেছে? এখন তো তার হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়।

সোনা চোর! না, না, সে চোর নয়। সে চোর হতে পারে না। এমনিতেই হিমালয়ের মানুষরা বড় একটা অসৎ হয় না। তারা উপোস করে, কিন্তু চুরি করে না। তার ওপর সোনার মতো ছেলে কখনই চুরি করতে পারে না। তাহলে ওরা এভাবে চলে গেল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম দু'দিন বাদে, ওসলায় ফিরে। সোনা পালিয়ে যাবার পরের দিন গভীর রাতে আমরা ওসলা পৌঁচেছিলাম। নেতা অমূল্য সেন পরের দিনটিতে আমাদের বিশ্রাম দিয়েছিল। গত কয়েকদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম ও দৈহিক কষ্ট করতে হয়েছে। আগের রাতে আমাদের শেষ দলটি যখন ওসলা পৌঁচেছে, তখন রাত সাড়ে তিনটা।

সেদিন সকালে তাই আমরা বেশি বেলা অবধি ঘুমিয়েছি; রোদ ওঠার অনেক পরে স্লীপিং-ব্যাগ ছেড়েছি। তারপরে বিশ্রাম-গৃহের আঙ্গিনায় বসে চা খেয়েছি, ওসলাকে দেখেছি আর বিগত দিনগুলির সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার স্মৃতি রোমন্থন করেছি। সোনার ভাবনাটা যে মনে আসে নি, তা নয়। কিন্তু সে ভাবনাকে খুব বেশি একটা মূল্য দিই নি।

এমন সময় সহসা সোনার সহযোগী পথ-প্রদর্শক এসে বিশ্রামগৃহে হাজির হল। বিরক্ত হলাম। গল্প গান আর হাসির ভেতর দিয়ে সময়টা সুন্দর কেটে যাচ্ছিল, এখন আবার হিসেবপত্র নিয়ে বসতে হবে। লোকটা নিশ্চয়ই টাকা নিতে এসেছে। কিন্তু সোনা! সোনা কোথায়?

লোকটি সেলাম করে আমাদের। বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করি—সেদিন ওভাবে না বলে-কয়ে চলে এলে কেন?

—কি করব সাব্, সোনার তবিয়ত যে বড়ই খারাপ হয়ে পড়ল। আপনারা তখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। আর দেরি

করা ঠিক মনে করলাম না। আমি ওকে নিয়ে চলে এলাম। ভাবলাম এখানে এলে দেখা তো হবেই। তাও অর্ধেকটা পথ সোনাকে আমার কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়েছে।

—কেন কি হয়েছে ওর?

লোকটি উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমরা কিছুই বুঝতে পারি না ব্যাপারটা। একটু বাদে কাঁদতে কাঁদতেই লোকটি বলে ওঠে—সোনা খতম হো গিয়া।

খতম হয়ে গেছে! আমরা আঁতকে উঠি! সোনা মারা গেছে? কি হয়েছিল তার? অমন সুন্দর স্বাস্থ্য আর এইভাবে মারা গেল!

—নহী সাব্। ও জিন্দা হ্যায়, লেকিন উসকি জিন্দগী বরবাদ হো গিয়া।

কি বলছে লোকটা! কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারলাম একটু বাদেই। সোনাকে নিয়ে এলো ওরা। সোনার দাদা তাকে পিঠে করে নিয়ে এলো। সঙ্গে তার বুড়ো বাপ-মা ও বৌদি। কয়েকজন প্রতিবেশীও এসেছে। না, চামেলি আসে নি সঙ্গে।

সোনার পা দু'খানির দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠি! কি হয়েছে ওর? প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ভয়ানক ভাবে ফুলে উঠেছে। গোড়ালি অবধি কালো হয়ে গেছে। ওর কি ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে? তুষারক্ষত···

ডাক্তারের মুখখানি শুকিয়ে যায়। সোনার বাবা মা ও বৌদি কেঁদে ওঠে। করুণ কণ্ঠে কেবলি বলতে থাকে—ডাক্তারসাব্, তোম সোনাকো আচ্ছা কর দেও।

ডাক্তার হাত নেড়ে তাদের থামতে বলে। তারা চোখ মোছে। সোনার চোখদুটিও ছলছল করছে।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে। তারপরে সোনার সহযোগীকে নিয়ে ফিরে আসে ঘরে। সে তার সঙ্গে কথা বলে। তারপরে আমাদের ডাকে। ডাক্তার বলে—সোনার ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে। দুটো পা-ই পচে গিয়েছে।

—কেন এমন হল? আমরাও তো ওরই মতো হাণ্টার শু পরে বরফে থেকেছি।

—ও যে পায়ের কোন যত্নই নেয় নি। দিনের পর দিন বরফের ভেতরে ভিজে জুতো-মোজা পরে রয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি করেছে সেদিন রাতে না খেয়ে এবং···ওভাবে চলে এসে। তু'দিন আগেও ওষুধ পড়লে এতটা খারাপ হত না।

—এখন উপায়?

—উপায় একটাই আছে।

—কি?

—তু'টো পায়েরই গোড়ালি পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে। সত্যিই সোনার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে শঙ্কুদা!

চামেলি? সোনার মনের মেয়ে চামেলি? তার কি হবে? কি করবে সে? বাকি একশ' টাকা আমরা তার মাকে দিয়ে দিলেই কি চামেলি সোনাকে বিয়ে করবে?

ভগবান কি সোনার সে সাধ পূর্ণ করবেন?

॥ নয় ॥

মহাকাব্যের যুগ বহু যুগ আগেই গত হয়ে গেছে কিন্তু মহাযোগীদের যুগ হয় নি শেষ। আজও হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিমালয়ের এই সব বিস্ময়কর সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা লিখতে গিয়ে স্বামী কৃষ্ণাশ্রমের কথা আমি ইতিপূর্বেও লিখেছি। তবু, আজ তাঁর কথা লেখার জন্যই কলম নিয়ে বসেছি। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের গর্বে গর্বিত আজকের এই ভোগ সর্বস্ব সমাজের কাছে সেই সর্বত্যাগী মহামানবের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে।

বছর পাঁচেক আগে গিরিতীর্থ-গঙ্গোত্রীতে তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন। তখন তাঁর বয়স একশো বাহান্ন বছর। জীবনের শেষ বিরাশি বছর তিনি গঙ্গোত্রীতে কাটিয়েছেন। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তিনি এই বিরাশি বছর স্থায়ীভাবে কেবল গঙ্গোত্রীতেই বসবাস করেছেন। তিনি সারা হিমালয়ের দুর্গমতম অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মন যখন যেখানে থাকতে চেয়েছে, সেখানেই থেকেছেন। কি খেয়েছেন, বাঘ-ভালুক তুষারপাত ও অসহ্য শীতের কবল থেকে কেমন করে রক্ষা পেয়েছেন, তা আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি, তিনি বহুবছর একাকী গোমুখীর ওপরে কাটিয়েছেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের সমস্ত পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রমের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল।

তাই ১৯৬৮ সালে সতপন্থ (২৩,২১৩´) অভিযানে যাবার পথে অভিযানের শারীরবৃত্তবিৎ ডাঃ অমিতাভ সেনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উপস্থিত হয়েছিলাম তাঁর গঙ্গোত্রীর কুঠিয়ায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে

তাঁকে প্রণাম করে প্রশ্ন করেছি—মহারাজ, আমরা সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে যাচ্ছি। আপনি তো সতপন্থকে জানেন, বলুন আমাদের অভিযান সফল হবে কিনা ?

মৌনী সন্ন্যাসী নিজের একখানি হাতের ওপর অন্য হাতখানির একটি আঙ্গুল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লিখে জানিয়েছেন—সতপন্থ কঠিন হ্যায়।

বলা বাহুল্য, আমরা সেবারে সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে পারি নি। কিন্তু সে ব্যর্থতার কথা থাক্, স্বামী কৃষ্ণাশ্রমের কথাই বলা যাক্।

স্বামীজী ছিলেন দীর্ঘদেহী--ছ' ফুটের ওপর লম্বা কিন্তু গঙ্গোত্রীতে যে কাঠের ছোট কুঠিয়াটিতে তিনি বাস করতেন, সেটির দৈর্ঘ্য ছ' ফুটের কম। অর্থাৎ সেই ঘরে তাঁর পক্ষে পা মেলে শোওয়া সম্ভব ছিল না। স্বামীজী ছিলেন দিগম্বর, কখনও কিছু গায়ে দিতেন না। অথচ তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় উচ্চহিমালয়ের তুষারপাতের মধ্যে কাটিয়েছেন।

তাই সেদিন ডাঃ সেনকে বলেছিলাম—আপনি তো হাই অল্‌টিচ্যুড্ ফিজিওলজিক্যাল রিসার্চ করবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছেন, স্বামীজীকে একটু পরীক্ষা করে দেখুন না ?

ডাঃ সেন উত্তর দিয়েছিলেন—কোন লাভ হবে না।

—কেন ?

—বিজ্ঞানের সকল সত্য ওঁর বেলায় মিথ্যে হয়ে যাবে।

—কেন এরকম হয় ? আমি প্রশ্ন করেছি।

বিলেত-ফেরত ফিজিওলজিষ্ট উত্তর দিয়েছেন—আমরা বলব অভ্যেস, আপনারা হয়ত বলবেন যোগ কিংবা সাধনা।

কথাটা ঠিকই বলেছিলেন ডাক্তারবাবু। কৃষ্ণাশ্রম মানুষ, সুতরাং তিনি ছিলেন দেহধারী। কিন্তু তাঁর সেই দেহ ছিল বিজ্ঞানের বিস্ময়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোভ-মোহ, শীত-গ্রীষ্ম, রোগ-শোক, জরা-বার্দ্ধক্য সবই তিনি জয় করেছিলেন।

আমি নিজে দেখেছি, প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি দুটি বিরাট বিরাট বালতি দুহাতে নিয়ে খাড়া পাড় বেয়ে গঙ্গোত্রীর গঙ্গায় নামতেন। প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ সময় ধরে সেই হিমশীতল জলে অবগাহন করতেন। সূর্যোদয়ের পরে সূর্য-প্রণাম সেরে দু' হাতে দু'বালতি জল নিয়ে সেই খাড়া পাড় বেয়ে উঠে আসতেন ওপরে—যে কোন যুবক ওয়েট-লিফ্‌টারের পক্ষেও কাজটি কষ্টকর। অথচ স্বামীজীর বয়স তখন দেড়শো বছর।

নিয়তপরিবর্তনশীল জগতে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম ছিলেন পরম বিস্ময়। মহাত্মার শিষ্য ভগবৎস্বরূপ আমাকে বলেছেন, শেষ বাষট্টি বছরে তিনি মহারাজের মধ্যে কোন মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন দেখতে পান নি।

মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের মহাজীবন সম্পর্কে সামান্য সংবাদই জানা যায়। তাঁর অন্যতম শিষ্য দিল্লীবাসী শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্যকে আমি এ বিষয়ে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, 'আধুনিক অনেক নামজাদা সাধুর মতো তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের ঘটা বা চমৎকারিত্ব ছিল না। নিভৃত গিরিকন্দরে বা হিমাবৃত প্রাঙ্গণে এই মৌনী ও নগ্ন সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞ-সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করতেন না। তাঁর যেটুকু অলৌকিকত্ব আমরা দেখেছি, সেটুকু আপনা থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর কাছে যখন থেকেছি, তখন এমন বহু ঘটনা ঘটতে দেখেছি, যেগুলিকে অনায়াসে অলৌকিক পর্যায়ে ফেলা যায়। অথচ সেগুলির কোনটাই তিনি বিভূতি প্রকাশের জন্য দেখান নি—ঘটনাগুলি আপনা থেকেই ঘটেছে।

'গুরু মহারাজ অহৈতুকী কৃপাবারিধি ছিলেন। সে কৃপার অবধি নেই, তল নেই—কারণও নেই। আবার সেই কৃপাসিন্ধুকে কখনও দেখেছি কোন কোন দর্শনার্থীকে দর্শন দান করতেন না। তিনি যে অন্তর্যামী ছিলেন। বহুদূর থেকেই মানুষের অন্তরলোক দেখতে পেতেন।'

স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা সত্যই সামান্য। সব মিলিয়ে দশজনও হবেন কিনা সন্দেহ। তবু তাঁর আরেকজন শিষ্যের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে। তিনি ১৫৬, রাসবিহারী এভেন্যুর ডাঃ এস. কে. নায়েক। তিনিও কৃষ্ণাশ্রমের মহাজীবন সম্পর্কে কিছু কথা আমাকে বলেছেন। সেই-সব অমৃত-সমান কথাই আজকের এই স্মৃতিপূজার প্রধান উপকরণ।

এ সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের কোন সন্দেহ নেই যে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম বড়ঘরের ছেলে ও তিনি প্রথম যৌবনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত। বেদ সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তাঁর মুখস্থ ছিল। শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষা দেবার সময়ে তিনি অনর্গল শ্লোক আবৃত্তি করে ব্যাখ্যা করে দিতেন।

স্বামীজী যৌবনেই গৃহত্যাগ করেন। তাঁরা দু-ভাই। ভাই নারায়ণও সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বামীজীর বহু আগে দেহরক্ষা করেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে কৃষ্ণাশ্রম কাশীতে বাস করতে থাকেন। চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাটের কাছে একটি আশ্রমে তিনি বাস করতেন। আশ্রমটি এখনও আছে। সহসা সেই আশ্রমের অধ্যক্ষের পদটি শূন্য হয়। আশ্রমবাসীরা কৃষ্ণাশ্রমকে অধ্যক্ষ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। বললেন—এক পদ ছোড় দিয়া, আউর এক পদ লেগা?

এই উক্তি থেকে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সন্ন্যাস-গ্রহণের আগে কৃষ্ণাশ্রম উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাছে জোর করে তাঁকে অধ্যক্ষ করা হয়, তাই স্বামীজী কাশী থেকে বিন্ধ্যাচল পালিয়ে গেলেন। তখন তাঁর কাছে দুটি কুণ্ডল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পেটের দায়ে সেই দুটিকে বিক্রি করে দিতে হল। তিনি চারশো টাকা পেলেন।

ঘটনাটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের। সেই আমলে যখন তিনি চারশো টাকা পেয়েছিলেন, তখন বুঝতে হবে কুণ্ডল দুটি

মহামূল্যবান ছিল। কাজেই কুণ্ডলের মালিক যে অত্যন্ত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

পেটের দায়ে কুণ্ডল বিক্রি করেছিলেন কৃষ্ণাশ্রম। কিন্তু ভগবান সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁকে ভোগ করতে দিলেন না। কেন দেবেন? কৃষ্ণাশ্রম সন্ন্যাসী। সঞ্চয় তো তাঁর জন্য নয়। তাই একদিন টাকার থলিটি চুরি হয়ে গেল। মহাত্মার মোহভঙ্গ হল।

কৃষ্ণাশ্রম তীর্থযাত্রা করলেন। দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য তীর্থ দর্শন করে হরিদ্বার পৌছলেন। কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে দেবাতাত্মা হিমালয়ের পথে পাড়ি দিলেন। অবশেষে তিনি উত্তরকাশী উপস্থিত হলেন। কাশী থেকে উত্তর-কাশী—তখনকার বিচারে বহুদূর। তাঁরও নিশ্চয়ই বহু বছর অতিবাহিত হয়েছিল এই পদ-পরিক্রমায়। এবং ইতিমধ্যে তিনি বসন পরিত্যাগ করেছিলেন।

প্রায় একশো বছর আগের কথা। আজকের জেলা-সদর উত্তরকাশী তখন একটি গণ্ডগ্রাম। চারিদিকে গভীর বন। দিনেও বাঘের ভয়। এখন যেখানে দুর্গামন্দির, ঠিক সেইখানে একটি গাছের ছায়ায় আসন পাতলেন কৃষ্ণাশ্রম।

মেষপালকরা যাতায়াতের পথে তাঁকে দেখে। দেখে দীর্ঘদেহী এক মৌনী সন্ন্যাসী পদ্মাসনে সমাসীন। তাঁর হাত দুখানি মুষ্টি-বদ্ধ, তিনি বাক্যহীন ও নিশ্চল। তাঁর চোখে পলক পড়ে না। মনে হয় যেন কোন জীবন্ত মানুষ নন, পাথরের মূর্তি। সবচেয়ে বিস্ময়কর, প্রায় শতবর্ষ পরে আমিও তাঁকে ঐ একই রূপে দেখেছি।

কৌতূহলী মেষপালকরা তাঁর চারিপাশে ভিড় করে। তারা ঘর থেকে রুটি ও দুধ এনে তাঁর সামনে রাখে। স্বামীজীর কোন ভাবান্তর ঘটে না। ওরা ভাবে, সাধু হয়তো তাদের সামনে খাবেন না। তারা তাই তাঁর সামনে খাবার রেখে তাড়াতাড়ি চলে যায় সেখান থেকে।

পরদিন সকালে তারা আবার আসে। সবিস্ময়ে দেখে, সন্ন্যাসী

ঠিক সেইভাবে বসে আছেন, খাবার ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। তখন তাদের একজন সাহস করে একখানি রুটি হাতে নিয়ে স্বামীজীর মুখের সামনে ধরে। আর আশ্চর্য! তিনি রুটিখানি মুখে নিলেন। তারপর কৃষ্ণাশ্রম যতদিন উত্তরকাশী ছিলেন, মেষপালকরা প্রতিদিন এসে এইভাবে তাঁকে খাইয়ে যেত

ভগবৎস্বরূপ আমাকে বলেছেন, প্রায় একশো বছর পরেও স্বামীজী একই রকম অভ্যাসে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব সময় বসে থাকতেন, কখনও শুতেন না। কোনদিন খেতে চাইতেন না, তবে খাইয়ে দিলে খেতেন। অবশ্যি দুয়েকখানি রুটি ও একটু দুধ ছাড়া আর কিছু বড় একটা মুখে নিতেন না, থু থু করে ফেলে দিতেন। বলা বাহুল্য, কথাটা শুনে ডাক্তারবাবু বিস্মিত হয়েছিলেন।

যাক গে সে-কথা, কিছুকাল উত্তরকাশীতে কাটিয়ে কৃষ্ণাশ্রম রওনা হলেন গঙ্গোত্রীর পথে। আঠারো মাইল হেঁটে ভাটোয়ারীতে পৌঁছে পিপাসা পেল তাঁর। তিনি জলের জন্য ভাগীরথীর তীরে নামলেন। তখনও তাঁর হাত দুখানি মুষ্টিবদ্ধ। তাই ঝুঁকে পড়ে মুখ দিয়ে জল খেতে চাইলেন। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে তিনি জলে পড়ে গেলেন। ভাটোয়ারীর ভাগীরথী—বড় বড় পাথরে পরিপূর্ণ নদীগর্ভের ভেতর দিয়ে দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে হিমশীতল বারিধারা। তিন মাইল ভেসে যাবার পরে সহসা কে যেন হাত ধরে তাঁকে তুলে দিল তীরে—একখানি বড় পাথরের ওপরে। অর্ধ-অজ্ঞান কৃষ্ণাশ্রম তাকিয়ে দেখেন ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে তীরে দাঁড়িয়ে খিল-খিল করে হাসছে।

কিন্তু তখন তাঁকে ধন্যবাদ দেবার মত শারীরিক অবস্থা ছিল না স্বামীজীর। তাই তিনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলেন। তারপরে চোখ খুলে আবার তীরের দিকে তাকালেন। চমকে উঠলেন। মেয়েটি নেই! এটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেল সে? বিস্মিত স্বামীজী সেদিন অনেক ছুটোছুটি করেও তাঁর সেই কিশোরী উদ্ধারকারিণীকে খুঁজে পান নি।

আগেই বলেছি, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শেষ বিরাশি বছর কৃষ্ণাশ্রম গঙ্গোত্রীতে কাটিয়েছেন এবং হিমালয়ের দুর্গমতম অঞ্চলে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ভাগীরথীর তুষারাবৃত তীরভূমির ওপর দিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী যাচ্ছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি সেই তুষারক্ষেত্রে কয়েক টুকরো তক্তা পড়ে থাকতে দেখলেন। কৌতূহলী অধ্যাপক অনেক কষ্টে একখানি তক্তা সরিয়ে ফেললেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, সেখানে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী শুয়ে রয়েছেন —সমাধিস্থ হয়ে আছেন। বলা বাহুল্য, তিনিই স্বামী কৃষ্ণাশ্রম।

ঋষি অরবিন্দের সহযোগী ও মানিকতলা বোমা মামলার অন্যতম আসামী হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন। ভোলানন্দ গিরিমহারাজের শিষ্য মহাদেবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বিশুদ্ধানন্দ গিরি নামে খ্যাত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি হরিদ্বার ভোলানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ একবার গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী রওনা হলেন। তুষারাবৃত দুর্গম পথ। কিছুদূর পদচারণার পরেই তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তিনি কাতর হয়ে অর্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় তুষারাবৃত প্রান্তরের ওপরেই শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে বিশুদ্ধানন্দ খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। তিনি উঠে বসলেন। সহসা সামান্য দূরে ধোঁয়া দেখতে পেলেন বিশুদ্ধানন্দ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মনুষ্যহীন প্রান্তরে মানুষের সান্নিধ্য লাভের আশায় বিচলিত হয়ে উঠলেন। এমনিই হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে থেকে থেকে আমরা মানুষের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি। মনুষ্যহীন প্রান্তরে মানুষ এই মূল্যবোধকে খুঁজে পায়—মানুষ তখন অমৃতের পুত্র রূপে দেখা দেয়।

সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন বিশুদ্ধানন্দ। শ্রান্ত দেহটিকে কোনমতে বয়ে নিয়ে তিনি পৌঁছলেন একটি গুহার

সামনে। আর তখুনি শুনতে পেলেন গুহার ভেতর থেকে কেউ তাঁকে বলছেন—আও বেটা, অন্দর আও।

টলতে টলতে বিশুদ্ধানন্দ গুহায় প্রবেশ করলেন। দেখলেন, ধুনি জ্বালিয়ে জনৈক দীর্ঘদেহী নগ্ন সন্ন্যাসী পদ্মাসন করে বসে রয়েছেন। তাঁর পাশে জনৈক ব্রহ্মচারী। বিশুদ্ধানন্দ বুঝতে পারলেন, সেই সন্ন্যাসী সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা স্বামী কৃষ্ণাশ্রম। তিনি তাঁকে প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণাশ্রম বিশুদ্ধানন্দকে আগুনের ধারে বসতে বললেন। ব্রহ্মচারীকে চা বানাবার নির্দেশ দিলেন।

ব্রহ্মচারী একখানি ছুরি ও একটি পাত্র নিয়ে গুহার বাইরে গেলেন। একটা সাদা পাথর চেঁচে খানিকটা পাথর-চূর্ণ নিয়ে এলেন। তারপরে পাথর-চূর্ণ সহ সেই পাত্রটি ধুনির ওপরে চাপিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাথর-চূর্ণ গলে দুধের মত সাদা খানিকটা তরল পদার্থে পরিণত হল। ব্রহ্মচারী তাঁর থলে থেকে কয়েকটি শুকনো শেকড় বের করে সেই দুধের ভেতর ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই সাদা দুধ চা-য়ের বর্ণ ধারণ করল। ব্রহ্মচারী সেই ফুটন্ত চা একটা গ্লাসে ঢেলে বিশুদ্ধানন্দের সামনে রাখলেন। কৃষ্ণাশ্রম কোমল কণ্ঠে তাঁকে বললেন—চা পী লো বেটা।

বিস্মিত বিশুদ্ধানন্দ গ্লাসটা হাতে নিলেন। তিনি সেই বিচিত্র চা পান করলেন। মুহূর্তে তার শরীর গরম হয়ে উঠল, সব শ্রান্তি দূর হয়ে গেল—তিনি সুস্থ হলেন।

বিশুদ্ধানন্দ সেদিনটা মহাত্মার সঙ্গে কাটালেন। পরদিন তিনি মহাত্মার কাছে গোমুখী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহাত্মা তাঁকে নিষেধ করলেন। বললেন—এই বাসনা পরিত্যাগ কর। গোমুখীর পথ এখন বড়ই দুর্গম। পথে তোর বিপদ হবে। স্বেচ্ছায় বিপদ বরণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। সন্ন্যাসীকে নির্ভয় হতে হবে, কিন্তু সে কখনই নির্বোধের মত অযথা বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে

পড়বে না। তার চেয়ে তুই আপন কর্মক্ষেত্রে ফিরে যা, সেখানে তোর জন্য অনেক বড় কাজ অপেক্ষা করছে!

বিশুদ্ধানন্দ ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁর কাজও তিনি করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেবারে গোমুখী যেতে পারেন নি। বিপ্লবী যুবক হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল যা পারেন নি, বৃদ্ধ কৃষ্ণাশ্রমের কাছে তা কিন্তু ছিল নিতান্তই ছেলে-খেলা।

উত্তরকাশীতে অনেকের কাছে শুনেছি যে, যখন কৃষ্ণাশ্রমের বয়স প্রায় একশো চল্লিশ বছর এবং যখন উত্তরকাশী-গঙ্গোত্রী বাসপথ তৈরি হয় নি, তখনও তিনি একদিনে গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী হেঁটে যেতেন। হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ সাতান্ন মাইল দুর্গম পাকদণ্ডি একদিনে পার হওয়া জগতের যে-কোন শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমকে খুবই ভক্তি করতেন। তাই বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি গঙ্গোত্রী গেলেন। উদ্দেশ্য, স্বামীজীকে কাশীতে নিয়ে আসবেন। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণাশ্রম? মালব্যজী গঙ্গোত্রীতে তাঁর দর্শন পেলেন না। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে গঙ্গোত্রীর মাইল কয়েক দূরে এক গুহায় স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মালব্যজী সেখানে গিয়েই স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন।

কৃষ্ণাশ্রম মালব্যজীর অনুরোধ রক্ষা করলেন। তিনি কাশীতে গিয়ে শিবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করলেন।

আর তারপরেই দলে দলে দর্শনার্থী ছুটে এলেন সেখানে। এলেন কয়েকজন দেশীয় রাজা। তাঁরা কৃষ্ণাশ্রমকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইলেন। কৃষ্ণাশ্রম রাজী হলেন না। তিনি রাজাদের প্রশ্ন করলেন—আমি কি কোন পণ্যদ্রব্য যে আমাকে আমদানী করতে এসেছ? আমি কারও বাড়িতে যেতে পারব না। পয়সা থাকলেই জগতের সব কিছু পাওয়া যায় না।

এই উক্তির পরেও কিন্তু বিত্তবানদের বোধোদয় হল না। তাঁরা তাঁকে বাড়িতে না নিতে পেরে প্রচুর টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা এনে কৃষ্ণাশ্রমের পদপ্রান্তে নিবেদন করলেন।

স্পর্শ করা তো দূরের কথা, স্বামীজী ফিরেও তাকালেন না ঐ সব ঐশ্বর্যের দিকে। তিনি নিঃশব্দে বসে রইলেন। তাঁর মুখে একটা বিরক্তির ছাপ প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু তা বিত্তবান ভক্তদের নজরে এল না।

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা সবই যেমন ছিল, তেমনি পড়ে আছে। কেবল কৃষ্ণাশ্রম নেই সেখানে। মোহমুক্ত সন্ন্যাসী ঐশ্বর্যের জগৎ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, মালবাজী তাঁর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে কিছুদিন পরে তিনি খবর পেলেন, কৃষ্ণাশ্রম গঙ্গোত্রী ফিরে গিয়েছেন। কেমন করে, তা আজও কেউ বলতে পারেন না। একজন শতাধিক বছরের দিগম্বর সন্ন্যাসী কপর্দকহীন অবস্থায় কেমন করে কাশী থেকে গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন, তা কেউ বুঝে উঠতে পারেন নি।

এই মহাযোগী খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর গঙ্গোত্রীর পথে গাংনানীর কাছে পুনগরে ভাগীরথীর তীরে মহাসমাধিতে মগ্ন হন। সমাধিলাভের আগে মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর শিষ্যা ও সেবিকা ভগবৎস্বরূপ মাতাজীর কাছে দেহত্যাগের বাসনা প্রকাশ করতেন। একদিন মাতাজী তাঁকে বলে ফেললেন—ইয়ে তো অপ্‌নে হাথ কি বাত নহী।

মৌনী স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে ইসারায় উত্তর দিলেন—যোগী-কো আপনা হাথ কি বাত হ্যায়। যোগী চাহে তো শরীর রাখে, ঔর চাহে তো শরীর ছোড় দে।

বিদায় বেলায় মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম তাঁর উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। দেহত্যাগের পুণ্যতিথিতে তিনি সকালে মাতাজীকে

ইসারায় জানিয়ে দিলেন—শরীরটা বড় পুরনো হয়ে গেছে, কাজেই তিনি সেদিনই দেহত্যাগ করবেন। তারপরই তিনি গোমুখ-আসনে বসে কয়েকবার ওঁকার ধ্বনি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন।

এমনি নানা অবিশ্বাস্য কাহিনীতে ভরা কৃষ্ণাশ্রমের জীবন। এই ক্ষুদ্র স্মৃতিকথায় সেই মহাজীবন সম্পর্কে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। আমি তাই আরেকটি কাহিনী বলে আমার স্মৃতিপূজা শেষ করব।

বছর পঁচিশেক আগের কথা। তখনও মহাত্মার কাঠের কুঠিয়া তৈরি হয় নি। মানে, তিনি তৈরি করতে দেন নি। কারণ ঝড় তুষারপাত ও রোদ উপেক্ষা করে আকাশতলে রাত্রিযাপন তাঁর বেশি পছন্দ ছিল। কৃষ্ণাশ্রম তখন খাড়া একটা পাহাড়ের পাদদেশে উন্মুক্ত আকাশতলে আসন পেতেছিলেন।

সেবারে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল গঙ্গোত্রীতে। সহসা স্বামীজীর পেছনের পাহাড়টিতে ফাটল দেখা দিল। ভগবৎস্বরূপ উতলা হলেন। পাণ্ডা ও সন্ন্যাসীরা ছুটে এলেন স্বামীজীর কাছে। আসন্ন ধস্ সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করতে চাইলেন।

ফাটলটাকে একবার দেখে নিয়ে নির্বিকার চিত্তে কৃষ্ণাশ্রম প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি আমাকে অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিতে বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুভানুধ্যায়ীরা সবিনয়ে বললেন—চলুন, ধর্মশালায় গিয়ে বিশ্রাম করবেন। একে তো বৃষ্টি, তার ওপরে যে-কোন সময় ধস্ নামতে পারে।

একটু হেসে কৃষ্ণাশ্রম জানালেন—ভগবানের যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে আমি ধস্ চাপা পড়ে মারা যাব, তাহলে তোমাদের সাধ্য কি আমাকে রক্ষা করবে? ধর্মশালার পাশেও পাহাড় আছে। সে পাহাড়েও তো ধস্ নামতে পারে। ভগবান যে সর্বত্র বিরাজমান।

শুভানুধ্যায়ীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। স্বামীজী কিছুতেই নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেন না। প্রবল বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা

করে তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন। পাণ্ডা ও সন্ন্যাসীরা ভগবৎ-স্বরূপকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেলেন।

তাদের অনুমান কিন্তু মিথ্যে হয় না। সন্ধ্যার একটু পরেই সেখানে ধস্ নামল। শব্দ শুনে সবাই শিউরে উঠলেন। ছুটে গেলেন সেখানে। দেখলেন স্বামীজী ধসের নিচে চাপা পড়েছেন। তাঁরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বুঝতে পারলেন মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের মহাজীবনের অবসান হয়েছে। কিভাবে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়, তাঁরা সেই আলোচনা করতে থাকেন।

সহসা সেই প্রস্তরস্তূপের নিচের থেকে ভেসে আসে মানুষের কণ্ঠস্বর। আর্তনাদ নয়, ওঙ্কারধ্বনি—হরি ওঁ, হরি ওঁ, সমবেত ভক্তবৃন্দ সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে পাথর সরাতে শুরু করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তাপ্লুত অর্ধ-অচেতন কৃষ্ণাশ্রমকে উদ্ধার করলেন তাঁরা। দেখলেন অবিশ্বাস্য হলেও বেঁচে আছেন তিনি। কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে তারা হায় হায় করতে থাকেন।

একটু বাদে কৃষ্ণাশ্রম ইশারায় তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা সে আদেশ পালন করলেন। যন্ত্রণাকাতর কৃষ্ণাশ্রম নিঃশব্দে শুয়ে থাকেন সেখানে। তিনি শুধু শুয়ে শুয়ে ভাগীরথীকে দেখেন। রাত যায়, দিন অতিবাহিত হয়।

খবরটা রটে যায়। উত্তরকাশী থেকে সরকারী ভক্তরা ছুটে আসেন গঙ্গোত্রীতে। টিহরীর মহারাজও তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তাদের কাউকে তাঁর দেহ স্পর্শ করতে দিলেন না কৃষ্ণাশ্রম। অস্ফুট স্বরে কোনমতে বললেন —তোদের কি সাধ্য আমাকে ভাল করে তুলবি? ভগবানের ইচ্ছায় আমি আহত হয়েছি, ভগবান ইচ্ছা করলে আমি তোদের সাহায্য ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠব। না হলে, তাঁরই পদতলে আশ্রয় নেব।

বাইশ দিন সেই ভাবে প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় ভাগীরথীর তটে শুয়ে রইলেন কৃষ্ণাশ্রম। রোদ জল ও ঝড় বয়ে গেল তাঁর আহত ও দুর্বল দেহের ওপর দিয়ে। কোনদিন শিষ্যা ভগবৎস্বরূপের

হাত থেকে কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল গ্রহণ করলেন, কোনদিন বা নিরম্বু উপবাসে রইলেন। কিন্তু কখনও ওষুধ খেলেন না।

বাইশ দিন পরে তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। ভাগীরথীর সেই খাড়া পাড় বেয়ে উঠে এলেন ওপরে। সবিস্ময়ে সবাই দেখলেন, কোন চিকিৎসা ছাড়াই মৃত্যুপথযাত্রী মহাযোগী কৃষ্ণাশ্রম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

তারপরে আরও প্রায় পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। সুদীর্ঘ কালে কেউ তাঁকে অসুস্থ হতে দেখেন নি। কেমন করে দেখবেন? নিজের ইচ্ছাতেই তিনি সেবারে আহত হয়েছিলেন, নিজের ইচ্ছাতেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁর ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না আমার। এবং তাই পঁচিশ বছর পরে এক পুণ্যতিথিতে উত্তরাখণ্ডের এই মহাযোগী সজ্ঞানে মরদেহ ত্যাগ করে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। আমরা সৌভাগ্যবান, সেই সুমহান সন্ন্যাসীকে দর্শন করেছি, প্রণাম করেছি—তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি।

গঙ্গোত্রী আজও আছে, চিরকাল থাকবে। কিন্তু একালের যাত্রীরা আর দর্শন করতে পারবেন না মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমকে। তাহলেও তাঁদের কাছে আমার একটি অনুরোধ রইল। তাঁরা যেন গঙ্গোত্রী পৌঁছে একবার অন্তত কেদারগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে স্বামীজীর সেই ছোট্ট কুঠিয়াটির সামনে গিয়ে দাঁড়ান—সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম জানান মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমকে। কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণাশ্রম যে আজও রয়েছেন সেখানে—মিশে আছেন গিরিতীর্থ-গঙ্গোত্রীর ধূলিকণায় আর ভাগীরথীর করুণাধারায়। তাঁর মৃত্যু নেই।

আসুন, আমরাও সেই মৃত্যুহীন প্রাণকে প্রণাম জানাই।

॥ দশ ॥

কেদারনাথ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি শিবালয় হিমালয়ের একটি শিবতীর্থ। শিব সেখানে কেদারনাথ রূপে চিরবিরাজমান। কথিত আছে সত্যযুগে মহাত্মা উপমন্যু শিবের তপস্যা করেছিলেন সেখানে। তপোমুগ্ধ শিব সেই থেকে বিরাজ করছিলেন কেদারনাথে। ত্রেতাযুগে তিনি একদিন শুনতে পেলেন ভ্রাতৃহন্তা পঞ্চ-পাণ্ডব তাঁকে দর্শন করতে আসছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মহিষাকার শিলারূপ ধারণ করে পাতাল প্রবেশে উদ্যত হলেন। কিন্তু পারলেন না! ভীম ছুটে এসে জাপটে ধরলেন তাঁকে। পাণ্ডবদের ভক্তিতে ভুলে ভোলানাথ তাঁদের ক্ষমা করলেন। পাণ্ডবরা ভ্রাতৃহত্যার পাপমুক্ত হলেন। তাঁরা বৃষরূপী সেই শিলাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করলেন মন্দির। অনন্তকালের মুক্তিতীর্থে পরিণত হল কেদারনাথ।

গাড়োয়াল হিমালয়ের মন্দাকিনী উপত্যকায় অবস্থিত এই তীর্থ। উচ্চতা ১১,৭৫০ ফুট। যাবার পথ ঋষিকেশ থেকে বাসে সোনপ্রয়াগ। সেখান থেকে হাঁটাপথে কেদারনাথ ১১·৫ মাইল।

কেদারনাথ কেবল তীর্থ কিংবা উপত্যকার নাম নয়। উপত্যকাটি যে পর্বতশ্রেণীর পদপ্রান্তে অবস্থিত তার নামও কেদারনাথ। দুটি প্রধান শিখর নিয়ে এই পর্বতমালা—কেদারনাথ শৃঙ্গ (২২,৭৭০´) ও কেদারনাথ স্তম্ভ (২২,৪১০´)। ১৯৬৭ সালে আমরা এই শিখর দুটিতে এক অভিযানের আয়োজন করেছিলাম। প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) আমার সহযাত্রীরা কেদারনাথ স্তম্ভের শীর্ষে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করে। কিন্তু প্রবল তুষারপাত ঝড়ের জন্য আমরা কেদারনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারিনি।

আমরা না পারলেও কেদারনাথ শৃঙ্গ অপরাজিত নয়। ১৯৪৭ সালের আন্দ্রে র-শয়ের নেতৃত্বে এক সুইস অভিযাত্রীদল এই সুদুর্গম আরোহণ করেছেন। গৌরবের কথা বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীতেনজিং নোরগে শিখর বিজয়ীদের অন্যতম এবং কেদারনাথ শৃঙ্গই তাঁর জীবনের প্রথম পর্বতশিখর।

শ্রীনোরগের কিন্তু সেই শিখরারোহণের কোন কথাই ছিল না। কারণ তিনি পর্বতারোহী হিসেবে সেবারে দলে যোগ দেননি। অভিযাত্রীদলে মিসেস এ্যানোলিস লোহনার নামে একজন সদস্যা ছিলেন। তাঁকে দেখাশুনা করাব জন্যই তেনজিং দলভুক্ত হয়েছিলেন। টাইগার ওয়াংদি নরবু ছিলেন অভিযানের শেরপা সর্দার।

নির্দিষ্ট দিনে শিখর অভিযাত্রীরা চূড়ান্ত সংগ্রামে রওনা হয়ে গেলেন। তেনজিং ও মিসেস লোহনার (এখন সাটার) শেষ শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা বিজয় অভিনন্দন জানাবার প্রতীক্ষায় রইলেন।

সেদিন তাঁদের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। সন্ধ্যার আগে অভিযাত্রীরা ফিরে এলেন বটে কিন্তু এ্যানোলিস ও তেনজিং তাঁদের দেখে শিউরে উঠলেন। তাঁরা সবাই আহত—সারা শরীরে চাপ চাপ রক্ত।

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে ব্যথাহত অভিযাত্রীরা জানালেন—তাঁরা পরাজিত। বললেন—দুটি দড়িতে শিখর গিরিশিরা ধরে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁরা। শিখরের খুবই কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নরবু ও আলফ্রেড সাটার ছিলেন একটি দড়িতে। হঠাৎ ওঁরা দুজনে প্রায় হাজার ফুট নিচে পড়ে যান। নরবুর একখানি

পা ভেঙে গেছে, আরেকখানি সাটারের ক্র্যাম্পনের খোঁচা লেগে জখম হয়েছে। দুজনেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সাটার তবু কোনমতে হেঁটে আসতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ক্লান্ত অভিযাত্রীদের পক্ষে নরবুকে বয়ে আনা সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনা স্থলের কাছেই একটি অস্থায়ী তাঁবু তৈরী করে নরবুকে রেখে এসেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই তেনজিং ছিলেন সবার চেয়ে সুস্থ এবং সবল। তাঁরই ওপর পরদিন নরবুকে নিয়ে আসার ভার পড়ল। সেদিন অবশ্য তেনজিং তাঁকে নিয়ে আসতে পারলেন না, কিন্তু নরবুকে তিনি আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করলেন। কারণ তাঁর দেরি দেখে নরবু ভেবেছিলেন—সহযাত্রীরা তাঁকে সেখানে ফেলে রেখে নিচে নেমে গিয়েছেন। তিনি আইস-এক্স দিয়ে নিজের গলা কাটার চেষ্টা করছিলেন। এই সময় তেনজিং উপস্থিত হলেন সেখানে। নরবু তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন।

নরবুকে খাবার ও ওষুধ খাইয়ে তেনজিং সেদিন একাই ফিরে এলেন। পরদিন তিনি নরবুকে বয়ে আনলেন শিবিরে। তাঁর সাহস শক্তি কৌশল এবং বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অভিযাত্রীরা মুগ্ধ হলেন। তাই তেনজিংয়ের চেয়ে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিমান শেরপা দলে থাকা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞ নেতা তাঁকেই নরবুর স্থলাভিষিক্ত করলেন। আহত নরবুকে চিকিৎসার জন্য মুসৌরীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এতবড় বিপর্যয়ের পরেও কিন্তু অভিযাত্রীরা কেদারনাথ শৃঙ্গারোহণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলেন না। একটু সুস্থ হবার পরেই তারা আবার চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। বলা বাহুল্য তেনজিং সেই সংগ্রামের সামিল হলেন। এবং ১১ই জুলাই (১৯৪৭) তারিখে আঁদ্রে রশ, আলফ্রেড সাটার, রেণে ডিটার্ট ও আলেকজান্ড্রা গ্র্যাভেনের সঙ্গে তিনি সুদুর্গম কেদারনাথ পর্বতশিখরে আরোহণ করলেন।

আর তারপরেই করুণাময় কেদারনাথের আশীর্বাদে তেনজিং নোরগের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তিনি একজন সুদক্ষ পর্বতারোহী হিসাবে স্বীকৃত হলেন। এবং সেই স্বীকৃতির মাত্র ছ' বছর পরে (২৯শে মে, ১৯৫৩) তেনজিংকে মাউণ্ট এভারেষ্ট (২৯,০২৮ ফুট) আরোহণের সুযোগ করে দিয়েছে।

শ্রীনোরগে নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন—

'It was a great honour. To be a Sirdar is the ambition of every Sherpa, a turning point in his life············, this was the first time I had ever actually reached the top of a big mountain.'

আগেই বলেছি সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ তেনজিংয়ের সেই সাফল্যের বিশ বছর পরে আমরা ২২, ৪১০ ফুট উঁচু কেদারনাথ স্তম্ভ শীর্ষে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছি। এবারে সেই সফলকাম অভিযানের কথা বলছি।

কেদারনাথ উপত্যকার উপকণ্ঠে কেদারনাথ পর্বতমালা। কিন্তু উপত্যকা থেকে পর্বতে আরোহণ করবার পথ নেই। মাঝখানে দুর্ভেদ্য পর্বত-প্রাচীর। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের যে কোন পর্বত শৃঙ্গের পাদদেশে পৌঁছবার সবচেয়ে সহজ পথ ভাগীরথীর উৎস গোমুখী দিয়ে। আমরাও সেই পথেই কেদারনাথ শৃঙ্গের পূর্ব-পাদদেশে অর্থাৎ গিরিতীর্থ-কেদারনাথের অপর প্রান্তে পৌঁছেছিলাম। কাজেই সেবারে কেদারনাথ পর্বত অভিযানে গিয়েও করুণাময়—কেদারনাথকে দর্শন করি নি।

এগারোজন অভিযাত্রী ৮ই সেপ্টেম্বর হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে চড়ে রওনা হলাম ঋষিকেশ। পথে লখনউতে দার্জিলিং থেকে আগত পাঁচজন শেরপা—ছুপ্পে, নিমা থাণ্ডুপ, দা রিঞ্জি, সোনা ও দোরজি যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। ঋষিকেশে যোগ দিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বি. ডি. নাইথানি এবং তাঁর তিন সহকারী সুরেন্দ্র, শ্যাম ও কারকি।

দুখানি বাসে করে ১১ই সেপ্টেম্বর সকালে প্রবল বর্ষায় পথে ধস নামায় আট ঘণ্টার পথ পেরোতে দু'দিন লাগল। আমরা ১৩ই সন্ধ্যায় উত্তরকাশী পৌঁছলাম। মালবাহক নিয়োগ এবং ইনার-লাইন ও ক্যামেরা পারমিট সংগ্রহের জন্য দুদিন থাকতে হল জেলা-সদর উত্তরকাশীতে। গতবছর। থেকে অবশ্য গোমুখী যাত্রীদের কোন পারমিট নিতে হচ্ছে না, তখন লাগত।

যাক্ গে সে কথা। উত্তরকাশীতে অভিযানের ভূতাত্ত্বিক এ. পি. তেওয়ারী প্রতিরক্ষা দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার মেজর পি. এস. মূর্তি এবং দ্বাদশ অভিযাত্রী রামনাথ আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। তেইশজন সদস্য পঞ্চাশজন মালবাহক ও সাড়ে তিন টন মাল নিয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর সকালে আমরা উত্তরকাশী থেকে তিনখানি বাসে করে গঙ্গোত্রীর পথে রওনা হলাম। তখন হরশিল পর্যন্ত বাস যেত।

পরে একদিন কথায় কথায় উদ্ভিদ বিজ্ঞানী. নাইথানি আমাকে বলেছে—ভেষজ উদ্ভিদের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এই তপোবন। হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে এমন হাজার হাজার ক্ষেত্র রয়েছে।

শুনে দুঃখ পেয়েছি। এত অভাব অনটন সত্ত্বেও আমরা হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণ করার চেষ্টা করছি না। হিমালয় যে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করতে সক্ষম, এই সহজ সত্যটাকে আমরা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

কিন্তু মাল্লা পৌঁছেই ধসের জন্য আমাদের বাসযাত্রার যতি পড়ল। ভাটোয়ারীতে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে শুরু হল পদযাত্রা। দুপুর রাতে হরশিল পৌঁছলাম। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকেলে অর্থাৎ ঋষিকেশ থেকে রওনা হবার সাতদিন পরে গিরি-তীর্থ—গঙ্গোত্রীতে (১০,৩০০´) পৌঁছন গেল।

পরদিন সকালে সহ-নেতা প্রাণেশ, সুজল, হিমাদ্রি, করুণাময়, অসিত, রামনাথ, স্বপন, কমল, মূর্তি ও দেবকীদা পঞ্চাশজন মালবাহক নিয়ে চিরবাসা চলে গেল। শেরপারাও তাদের সঙ্গী হল।

বাকি মালপত্র পাহারা দেবার জন্য নেতা অমূল্যের সঙ্গে আমি, বীরেন, বরেণ্য, তেওয়ারী ও নাইথানিরা গঙ্গোত্রীতে রয়ে গেলাম।

পরদিন মন্দিরে পুজো দিয়ে মা-গঙ্গার কাছে সাফল্য ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করলাম। গোমুখীতে মাল রেখে সেদিন বিকেলেই মালবাহকরা গঙ্গোত্রী ফিরে এলো। বাকি মাল নিয়ে ২০শে সকালে আমরা রওনা হলাম ভাগরথীর উৎস গোমুখীতে।

বৃষ্টির জন্য কয়েক জায়গায় ধস নেমেছিল। তাহলেও রাস্তা মোটামুটি ভালই ছিল। পথে চিরবাসাতে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া হল। বিকেল পাঁচটায় গোমুখী (১২,৭৭০´) পৌছলাম। দেখা হল সহযাত্রীদের সঙ্গে, শুরু হল তাঁবু জীবন।

২০শে সকাল থেকেই ওপরে মাল পাঠানো আরম্ভ হল; ২৩শে সেপ্টেম্বর তপোবনের শেষপ্রান্তে ১৫.৫৪২ ফুট উচুতে স্থাপিত হল আমাদের মূল-শিবির।

শিবলিঙ্গ পর্বতের (২১, ৪৬৬´) পাদদেশে এক আশ্চর্য-সুন্দর সবুজ সমতল এই তপোবন। একদা জনৈক সন্ন্যাসী সেখানে তপস্যা করতেন বলে এই রমণীয় স্থানটির নাম হয়েছে তপোবন। দূরত্ব বেশি নয়, গোমুখী থেকে দু-তিন ঘণ্টার পথ। অবস্থানটি বিস্ময়কর। নিচে তুষার-সমুদ্র গঙ্গোত্রী হিমবাহ, ওপরে কঠিন পাথরের পর্বতশৃঙ্গ শিবলিঙ্গ। দুয়ের মাঝে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত কোমল মাটি। প্রায় মাইল আড়াই লম্বা ও আধ মাইল চওড়া; উচ্চতা চৌদ্দ থেকে ষোল হাজার ফুট। সবুজ সমতলের বুক বেয়ে বেয়ে চলেছে কয়েকটি রুপোলী ঝরণা।

মালপত্রের তদারকি করবার জন্য আমাদের কয়েকজনকে থাকতে হল গোমুখীতে। বিজ্ঞানীরাও রইলেন সেখানে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা আশেপাশের গিরিশিরায় আরোহণ করে বহু প্রজাতি সংগ্রহ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা শোয়া দু'শ প্রজাতি সংগ্রহ করেছেন। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলের আর কোন উদ্ভিদ সমীক্ষা হয় নি।

ভূবিজ্ঞানী শ্রীতেওয়ারী অনেক মাপঝোপ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ১৯৩৫ সালে ডাঃ জে. বি. অডেন যখন এই হিমবাহ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন, তারপর থেকে বিগত বাইশ বছরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় তিন ফার্লং পেছিয়ে গেছে। কেবল হিমবাহ নয়, চারিপাশের পাহাড়েরও বহু পরিবর্তন হয়েছে। এখানে বলে নেওয়া দরকার ১৯৩৫ সালের পরে আমরাই প্রথম এ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছি।

২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে আমরা গোমুখীর শিবির গুটিয়ে মূল-শিবিরে রওনা হলাম। আগের দলের পুতে রাখা লাল নিশান লক্ষ্য করে, পাথর আর বরফের ঢেউ অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম। ঘণ্টা দুয়েক চলে সুপ্রশস্ত গঙ্গোত্রী হিমবাহের অপর পাশে এলাম। তারপরে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। পৌঁছলাম তপোবনে।

তপোবনের শেষপ্রান্তে আমাদের মূল-শিবির। ডানদিকে শিবলিঙ্গ পর্বত—খাড়া উঠে গেছে। বাঁদিকে কয়েক'শ ফুট নিচে ঢেউ খেলানো বং-বেরংয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ। এখানে সে মাইল চারেক প্রশস্ত। অপর প্রান্তে চতুরঙ্গী হিমবাহ এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভাগীরথী পর্বতমালা। বিচিত্র সুন্দর তুষারাবৃত তিনটি শিখরের শৃঙ্গমালা। সবচেয়ে উঁচুটি ২২,৪৯৫ ফুট।

প্রাণেশ, হিমাদ্রি, বামনাথ, করুণাময় ও অসিত এগিয়ে গেল। শিবলিঙ্গ পর্বতের অপর পাশে কীর্তি হিমবাহে ১৬,৫০০ ফুটে অগ্রবর্তী মূল-শিবির প্রতিষ্ঠিত হল।

২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে অমূল্য ও বীরেন রওনা হয়ে গেল অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে। এই পথটুকু বড়ই দুর্গম। শিবলিঙ্গ পর্বতের খাড়া গা বেয়ে তাকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করতে হয়। নিচে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। ওপরে ছোট-বড় পাথর ঝুলছে। একটু বাতাস উঠলেই পাথর গড়াতে শুরু করে।

২৭শে সকালে সুজল ও বরেণ্য চলে গেল ওপরে। সেদিনই কীর্তি হিমবাহ পেরিয়ে কেদারনাথ পর্বতের পশ্চিম গিরিশিরার নিচে ১৮,৭৫০ ফুটে এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হল।

সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলল। পরদিনই ২০,৬০০ ফুটে কেদারনাথ স্তম্ভের উত্তর-পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা করল দু' নম্বর শিবির। এই দুই শিবিরের মাঝে ছিল একটা সুউচ্চ খাড়া বরফের দেওয়াল। কাজেই পর্বতারোহণ শিক্ষিত সভ্যরাই শুধু দু নম্বর শিবিরে গিয়েছে।

একে একে অভিযাত্রীরা সবাই ওপরে চলে গেল। বিজ্ঞানী ও কুলিদের নিয়ে আমি রয়ে গেলাম মূল-শিবিরে—মালপত্রের তদারকি এবং সংবাদ পাঠাবার জন্য। প্রতিদিন সকালে কুলিরা মাল নিয়ে ওপরে কিংবা কাঠ আনতে নিচে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা ব্রেক-ফাস্ট করে প্যাক্‌ড-লাঞ্চ নিয়ে সারাদিনের জন্য সমীক্ষা ও সংগ্রহে বেরিয়ে যায়। আমি তখন সঙ্গীহীন।

রিপোর্ট লেখা শেষ করে আমি এসে বসি তাঁবুর বাইরে। আমার তখন অফুরন্ত অবসর। তাই তাকিয়ে থাকি ভাগীরথী শৃঙ্গমালার দিকে। আমার নিঃসঙ্গ অবসর আনন্দময় হয়ে ওঠে।

অবিস্মরণীয় ভাগীরথীর দিকে তাকিয়ে আমি কখনই ক্লান্ত বোধ করি না। প্রহরে প্রহরে রূপ বদলায় সে। সকালে রোদ ওঠার আগে তাকে মনে হয় সাদা চুনা পাথরে তৈরি। তারপরে সারাদিন জুড়ে তার সারা অঙ্গে সোনা আর রূপার ছড়াছড়ি। কালো আর বাদামীর বাহার। দিনমান তাকে ঘিরে রোদ আর মেঘের লুকোচুরি। দেখে দেখে দিন কেটে যায় আমার।

মাঝে মাঝে অভিযানের খবর আসে ওপর থেকে। অবশেষে জানতে পারি—৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে করুণাময়, নিমা, ছুঞ্জে ও দা রিণজিকে নিয়ে অমূল্য দু নম্বর শিবির থেকে বেরিয়ে পড়েছিল—তখন সকাল পৌনে নটা। ওরা সকলেই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। ওদের মনে হয়েছিল সেখান থেকে কেদারনাথ স্তম্ভের শীর্ষে

পৌঁছতে বড়জোর ঘণ্টা আড়াই সময় লাগবে। তাই ওরা দুপুরের খাবার সঙ্গে নেয় নি। ঠিক করেছিল ফিরে এসে গরম খাবার খাবে। এমন কি নিমা ছাড়া আর কেউ টর্চ পর্যন্ত সঙ্গে নেয় নি। কাজটা কিন্তু ঠিক করে নি। কারণ পর্বতারোহীকে সর্বদা চরম বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে না নিয়ে কখনই পর্বতারোহণে বের হওয়া ঠিক নয়।

আড়াই ঘণ্টা পথ চলার পরে ওরা সেদিন সবিস্ময়ে দেখতে পেলো কেদারনাথ স্তম্ভ ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের কাছে ডাকছে। আরও আড়াই ঘণ্টা আরোহণ করার পরেও স্তম্ভের অবস্থানের তেমন কোন পরিবর্তন হল না। নিমা ছ'বার এভারেষ্ট অভিযানে অংশ নিয়েছে। প্রতিবারই সাউথ-কল্ (২৬,১৮১´) পর্যন্ত গেছে। সেও স্বীকার করেছে, এমন অবস্থা তার জীবনে এই প্রথম।

আরও ঘণ্টা দুয়েক আরোহণ করার পরে ওদের মনে হল স্তম্ভ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তখনও অনেকখানি বাকি। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। সঙ্গে একটি মাত্র টর্চ। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সবার শরীর অবসন্ন। তাহলে কি ফিরে যাবে এতদূর এসে?

কিন্তু কেদারনাথ যে কাছে ডাকছে। সে ডাক ওরা উপেক্ষা করবে কেমন করে? ওরা এগিয়ে চলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বিকেল সাড়ে চারটার সময় অভিযাত্রীরা স্তম্ভে পৌঁছল। কেদারনাথ পর্বতমালার প্রথম ভারতীয় অভিযান সফল হল।

অন্ধকার ও তুষারপাতের মধ্যে অসংখ্য তুষারগহ্বর পেরিয়ে একটি মাত্র টর্চের সাহায্যে ছ'জন অভিযাত্রী সেদিন কেমন করে শিবিরে ফিরে এসেছে, সে কথা বলে আমি আর এ কাহিনীকে দীর্ঘতর করব না। শুধু এটুকু বলছি যে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অভিযাত্রীরা শরীরের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে রাত আটটায়

কোনমতে শিবিরে পৌঁছতে পেরেছিল। এবং সৌভাগ্যবশতঃ তারা তাঁবু খুঁজে পেয়েছিল।

আমরা হিমালয়ে গিয়েছিলাম। সাধ্যমত পর্বতারোহণ ও বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শেষ করে সকলে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছি চল্লিশদিন পরে। ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে আমাদের এ অভিযান কি স্থান পাবে, তা বিচার করবেন ইতিহাসকার। আমি কেবল এটুকু বলতে পারি, আমরা কেউ কর্তব্যকে অবহেলা করি নি! দুঃসহ শীতকে (০° থেকে ১৫° সেঃ) উপেক্ষা করে প্রত্যেকে নিজের কাজ করেছি। প্রস্তরবৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে গেছি। প্রাণেশ ও সুজল ১২,৮০০ ফুটে তুষার ঝড়ের ভেতরে রাত কাটিয়েছে। বরেণ ও করুণাময় মুখীমঠের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেছে। ডাক্তার স্বপন দরিদ্র হিমালয়বাসীদের চিকিৎসা করেছে ও মনুষ্য দেহে উচ্চতার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছে। পর্বতারোহণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও গবেষণাকে যুক্ত করাই ছিল আমাদের সে অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। আনন্দের কথা আমাদের সেই প্রচেষ্টা একালের পর্বতারোহীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে অনাবিষ্কৃত হিমালয় আবিষ্কৃত হবে, এবং সেদিন আমাদের কেদারনাথ স্তম্ভ অভিযান অবশ্যই সার্থক বলে স্বীকৃত হবে।

॥ এগারো ॥

গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে আরেকটি সুদুর্গম পর্বত শিখরের নাম সতপন্থ। উচ্চতা ২৩,২১৩ ফুট। এটি ভারতের দশম এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের দ্বিতীয় উচ্চতম শিখর। বিগত বিশ বছরে ভারতীয় পর্বতারোহীরা মাউণ্ট এভারেস্ট সহ হিমালয়ের শতাধিক দুর্গম শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অথচ সতপন্থ এখনও অপরাজিত।

আমরা ১৯৬৮ সালে সতপন্থ আরোহণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ভারতীয় পর্বতারোহীরা এখন পর্যন্ত সতপন্থ শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি বলে সতপন্থ কিন্তু অপরাজিত নয়। ১৯৪৭ সালে আঁদ্রে রশ-য়ের নেতৃত্বে কেদারনাথ পর্বতবিজয়ী সুইস অভিযাত্রীরা এই দুর্গম ও সুন্দর শিখরটিতেও আরোহণ করেছেন। সেই বিস্ময়কর আরোহণ আজও বিশ্ব-পর্বতারোহণের ইতিহাসে একটি অক্ষয় অধ্যায়।

সুইস অভিযাত্রীরা কেদারনাথ পর্বত আরোহণের পরে সতপন্থে গিয়েছিলেন। অভিযাত্রীরা ২৯শে জুলাই সতপন্থ থেকে নেমে আসা অনামী হিমবাহে (১৮,০০০´) এক নম্বর শিবির স্থাপিত করেন। ৩০শে জুলাই ১৯,০০০ ফুটে দু'নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করেন। ৩১শে জুলাই দু'নম্বর শিবির স্থাপনের পরে শিখরের খানিকটা পথ তৈরি করেন। তাঁরা ১লা আগষ্ট (১৯৪৭) সেই দু'নম্বর শিবির থেকে রওনা হয়ে শিখরে আরোহণ করেন। ৪,২১৩ ফুট আরোহণ করতে তাঁদের দশ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তাঁরা

ভোর চারটায় রওনা হয়ে বেলা দুটোয় শিখরে পৌঁছান। আর এই পথটুকু নেমে আসতে সময় লেগেছিল চার ঘণ্টা। একটানা সেই চোদ্দ ঘণ্টা পর্বতারোহণের বিস্ময়কর কাহিনী কীর্তন করবার জন্যই আজ আমি কলম নিয়ে বসেছি।

১লা আগষ্ট ভোর চারটের সময় উনিশ হাজার ফুট উঁচু দু'নম্বর শিবির থেকে অভিযাত্রীরা শিখরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ওঁরা সেদিন সঙ্গে কোন শেরপা নেন নি। প্রথম দড়িতে আলফ্রেড সাটার ও আলেকজান্দ্রা গ্র্যাভেন এবং দ্বিতীয় দড়িতে রেগে ডিটার্ট ও নেতা আঁদ্রে রশ। তখনও আঁধার ছিল, কিন্তু প্রথম ঢালটি অতিক্রম করার সময়েই সূর্যোদয় হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা আগের দিন যে পর্যন্ত পথ তৈরি করতে পেরেছিলেন সেখানে পৌঁছে গেলেন। সময় সংক্ষেপ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্গমপথে সোজাসুজি শিখরের দিকে এগোতে থাকলেন। আইস-একস দিয়ে ধাপ কেটে কেটে প্রথমে চললেন গ্র্যাভেন। তিনি গিরিশিরাটির অপরদিকে এগিয়ে গেলেন। উপস্থিত হলেন একটা ঢালের ওপর। সেখানে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যাবে। রশ-য়ের ভাষায়—'Giddy slope which ended in a contour that dropped 4,000 ft, to the long glacier…'

সেখান থেকে তাঁরা সংকীর্ণ শিখর-শিরার বাঁ-দিকের ঝুলন্ত তুষার-কার্ণিশের নিচ দিয়ে শিখরকে ঘুরে এলেন একবার। তারপরে আবার ডানদিকে এগোলেন। সোজা উঠে এলেন একটা স্তম্ভের ওপরে। আর এজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ধাপ কেটেছেন পথ-প্রদর্শক গ্র্যাভেন।

ওঁরা সৌভাগ্যবান। সতপন্থের পশ্চিম ঢালের ওপরে ঝরা আগের রাতের তুষারধারা ততক্ষণে জমে গিয়েছিল। সেখানে পাহাড়টা ঢালু হয়ে একটা ঢিবির সৃষ্টি করেছে। তার ওপরে বসে তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। এই জায়গাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে

রশ বলেছেন—'We climbed straight upto a dome..... where we sat the mountain sloped up over a rounded hump....'

সেই ঢিবির ওপর থেকেই শিখর-শিরা উঠে গিয়েছে। শিরাটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি খাড়া—কোথাও বা আরও বেশি। মাঝে মাঝে আবার পাথর হাঁ করে আছে। কিন্তু বরফ শক্ত হওয়ায় সুইস অভিযাত্রীরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে সক্ষম হলেন।

ঘণ্টা অতিবাহিত হতে থাকল, অভিযাত্রীরা আস্তে আস্তে সন্তপন্ত শিখরের দিকে এগিয়ে চললেন।

ক্রমাগত সাত ঘণ্টা পর্বতারোহণের পরে বেলা এগারোটার সময় তাঁরা শেষ ঢালের পাদদেশে পৌঁছলেন। সেদিন আবহাওয়া ছিল খুবই ভাল। কেবল উত্তরদিক থেকে প্রবল বেগে হিমশীতল বাতাস বইছিল। তবে তাতে তাঁদের নিঃশ্বাস নিতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না।

বাতাসের বেগ দেখে অভিযাত্রীরা তুষারধ্বসের আশঙ্কা করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ কান পেতে থেকেও কোন খারাপ শব্দ শুনতে পেলেন না। তুষারধ্বস নামবার মতো জায়গাও দেখতে পেলেন না চারিদিকে। তাঁরা নিশ্চিন্তে সেই ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন।

শিখরের পাঁচশ ফুট নিচে শেষ বড় পাথরটার পাশে পৌঁছে অভিযাত্রীরা আবার থমকে দাঁড়ালেন। সেখানে যে ঢালটা হঠাৎ আরও বেশি খাড়া হয়ে গিয়েছে। তার ওপরে সেখানে আবার ওপর থেকে বরফের কার্নিশ ঝুলছে! যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। এবং পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তুষার সমাধি। তাছাড়া ঢাল থেকেও তুষার ধস নামার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কি করবেন, তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারেন না।

সহসা রশ সহযাত্রীদের একখানি পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন, যাতে ওঁরা হাওয়ায় উড়ে না যান। তারপরে তিনি হামাগুড়ি

দিয়ে সেই ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন। প্রায় সত্তর গজ আরোহণ করলেন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নেতা সেখানে বরফ খুঁড়ে একটা গর্ত করলেন—বরফ পরীক্ষা করলেন; দেখলেন—পুরনো কঠিন বরফের ওপর দু' ফুট পুরু নতুন তুষারের আলগা আবরণ। উভয়ের মাঝে দানাবাঁধা তুষারের আস্তরণ—নিচের স্থায়ী বরফ থেকে ওপরে অস্থায়ী তুষারকে পৃথক করে রেখেছে। তার মানে ঠিক তুষারধসের উপযোগী অবস্থা। রশ-য়ের ভাষায়—'Perfect for avalanches.' এবং সেখানে ধস নামলে তাঁদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

কিন্তু নামল না তো। রশ ভাবলেন—এই যে আমি এর ওপর দিয়ে এতটা পথ উঠে এলাম, তাতে তো কোন ধস নামল না। এমনকি একটা ফাটল পর্যন্ত দেখা দিল না। কাজেই জায়গাটা দেখে যত বিপজ্জনক মনে হচ্ছে, আসলে তত বিপজ্জনক নয়। মনে হচ্ছে এই তুষারাস্তরণ চারজন মানুষের ওজন সইতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা—আমি পর্বতারোহী। এত কাছে এসে এত ভাল আবহাওয়া পেয়ে শিখরে আরোহণ না করা আমার ধর্ম নয়।

তবু রশ কোমর থেকে দড়ি খুলে আরো খানিকটা আরোহণ করলেন। দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য—তুষারাস্তরণ তাঁর ওজন সইতে পারছে। তিনি শিখরারোহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। সর্বকালের সর্বদেশের পর্বতারোহীরা রশকে এই সিদ্ধান্তের জন্য সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছেন। একটানা আট ঘণ্টা ক্লান্তিকর পর্বতারোহণের পরে, অজানা দুর্গম পর্বতগাত্রে প্রায় তেইশ হাজার ফুট উঁচুতে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, শান্ত ও স্থির মস্তিষ্কে এমন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের নজির খুব কমই আছে।

যাক্‌গে, যেকথা বলছিলাম—বিশ মিনিটের চেষ্টায় রশ শিখর-শিরার কাছে পৌঁছতে পারলেন। আর পৌঁছেই তিনি হিমালয়ের অন্তরলোকের অতুলনীয় রূপ দর্শন করলেন। সেই স্বর্গীয়

সুখ উপভোগের জন্য তিনি তাঁর সহযাত্রীদের আহ্বান করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের নেতার সঙ্গে মিলিত হলেন।

শিখরটি সেই গিরিশিরার পূর্বদিকে অর্থাৎ বাঁ পাশে অবস্থিত। গিরিশিরাটা আংশিক ঝুলন্ত এবং তার দক্ষিণাংশে ভিজে তুষার। তাই সামান্য সেই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে অভিযাত্রীদের দেড়ঘণ্টা সময় লাগল। গ্র্যাভেন ধাপ কেটে কেটে সবার আগে পথ চলেছেন।

বেলা ঠিক দুটোর সময় অর্থাৎ একটানা দশঘণ্টা আরোহণের পরে অভিযাত্রীদের স্বপ্ন সফল হল—তাঁরা সতপন্থ শিখরে উপস্থিত হলেন। সেই পরম মুহূর্তটির বর্ণনায় রশ বলেছেন—'Le moment supreme pour l' expedition'; অভিযানের মহত্তম মুহূর্ত।

সংকীর্ণ শিখর। সুতরাং সেখানে তাঁদের অপেক্ষা করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু চারিদিকে শ্বাসরোধকারী দৃশ্য দেখে তাঁরা পরিকল্পনার কথা ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন নিজেদের কথা, অতীত ও ভবিষ্যতের কথা। তারা শুধু অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন বৈকালীক সূর্যের সোনালী রোদে উদ্ভাসিত গাড়োয়াল—হিমালয়ের দিকে। হিমালয় তাঁদের অভিনন্দিত করছিল। অভিনন্দন জানাচ্ছিল কামেট থেকে নন্দাদেবী, দুনাগিরি, ত্রিশূল, চৌখাম্বা ও কেদারনাথ পর্বত সহ গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গ।

এই আশাতীত আরোহণের বিহ্বলতা কেটে যাবার পরে সাটার ও গ্র্যাভেন কিছুক্ষণ ধরে চারিদিকের ছবি তুললেন। তারপরে শুরু হল অবরোহণ।

শিখর-শিরার শেষপ্রান্তে নেমে আসতে তাঁদের মাত্র পনেরো মিনিট সময় লাগল। সেই সুদীর্ঘ গিরিশিরার শেষে পৌঁছতে লাগল একঘণ্টা। ততক্ষণে সতপন্থের পশ্চিমাংশ রোদে গরম হয়ে উঠেছে। তুষার গলতে শুরু করেছে। স্বভাবতই সেখানে তুষার-ধ্বসের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

রশ তাই প্রথমে একা দড়ি ধরে নেমে গেলেন নিচে। তার পরে কার্নিশের একখানি পাথরে খাঁচ কেটে দড়িটা বেঁধে রাখলেন। সঙ্গীরা দড়ি বেয়ে নিরাপদে নেতার কাছে নেমে এলেন।

গ্র্যাভেন ধাপ কেটে গিরিশিরার পূর্বপ্রান্তে চলে গেলেন। সেখানে তখন ছায়া পড়েছে—তুষার জমতে শুরু করে দিয়েছে। বিপদ কেটে গেল।

অবশেষে অভিযাত্রীরা বরফের সীমা ছাড়িয়ে পাথরের রাজ্যে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন মৃত্যুর জগৎ থেকে জীবনের জগতে। মাটির মানুষ ফিরে এলেন মাটিতে।

শিবিরে হাসির হুল্লোর আর গানের গমক শুরু হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন ঠিক বিকেল ছটা। তারিখটা ১লা আগস্ট ১৯৪৭—বিশ্ব-পর্বতারোহণের একটি পুণ্যতম তিথি।

॥ বারো ॥

আমরা হিমালয়ে যাই। যাই তার জানা-অজানা দুর্গম পথ-পর্যটনে। কখনও তীর্থদর্শনে কখনও বা পর্বতাভিযানে।

যাই, আবার ঘরে ফিরে আসব বলে। ফিরে এসে আবার হিমালয়ে যাব বলে। তারাও আমাদেরই মতো গিয়েছিল হিমালয়ে। আশা ছিল ফিরে আসবে ঘরে। কিন্তু তারা আর আসে নি ফিরে। দেবতাত্মা হিমালয়ের জলে স্থলে আর অন্তরীক্ষে তারা রয়ে গেছে চিরকালের তরে। রয়ে গেছে কারণ তারা নিঃশেষে প্রাণ দান করেছে। ক্ষয় নেই, তাদের ক্ষয় নেই।

তাদের সংখ্যা অনেক। তীর্থযাত্রীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কেবলমাত্র হিমালয় অভিযানে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছে, ভারতে তাদের সংখ্যাও সামান্য নয়। সুতরাং ভারতের কথা না বলে, আমি আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলতে বসেছি। বলছি সেই সব বাঙালী অভিযাত্রীদের কথা, যারা আমাদেরই মতো বে-সরকারী অভিযানে কিংবা পদযাত্রায় হিমালয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে আসে নি আমাদের মাঝে। আর্ভিন ও ম্যালোরী জয়াল ও বহুগুণা এবং মাদাম কোগান ও মিস তেইকো সুজুকির মতো তাঁরাও পর্বতারোহণের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে বে-সরকারী পর্বতারোহণ শুরু হয়েছে ১৯৬০ সাল থেকে। কিন্তু তার আগেই শ্রী এন. চক্রবর্তী নামে একজন বাঙালী পর্বতারোহী হিমালয়ে শহীদ হয়েছেন। তিনি ১৯৫৬ সালে গুরুদয়াল সিং-য়ের নেতৃত্বে গাড়োয়ালের মৃগথুনি (২২, ৪৯০´) অভিযানে গিয়েছিলেন।

বিগত চৌদ্দ বছরে সহস্রাধিক বাঙালী তরুণ-তরুণী পশ্চিমবঙ্গ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন দুর্গম-পদযাত্রা ও পর্বতাভিযানে অংশ নিয়েছে। কিন্তু ফেরে নাই শুধু পাঁচজন।

পর্বতারোহণ এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের কথা আমরা সেই অমর-শহীদদের প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। অথচ আজ তাদের স্মরণ করা একান্তই প্রয়োজন। তারা যে ভারতের জাগ্রত-যৌবনের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে গিয়েই আত্মাহুতি দিয়েছে।

যে পাঁচজন ফিরে আসে নি তাদের প্রথমা অণিমাদি—শ্রীমতী অণিমা সেনগুপ্তা।

অণিমাদি জন্মেছিল ১৯২০ সালে, বরিশালের গৈলা গ্রামে। তার বাবা শ্রীবিমলেন্দু সেন সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে শিক্ষার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। অণিমাদিও শিক্ষিকার জীবনই বেছে নিয়েছিল। এম. এ., বি. টি., ও এম. এড্, পাশ করে অণিমাদি উত্তর-কলকাতার শশীমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীর পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিল।

শৈশব থেকেই অণিমাদি হিমালয়ের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করত। তাই ১৯৫৩ সালে সে গিয়েছিল কৈলাস ও মানস-সরোবর।

তারপর একে একে গিয়েছে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও কেদার-বদ্রী (১৯৫৫), অমরনাথ (১৯৫৯), গোমুখী (১৯৬১), পিণ্ডারী হিমবাহ (১৯৬২) এবং ১৯৬৩ সালে রূপকুণ্ড।

১৯৬৪ সালে কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা ট্রেল্স পাস (গিরিবর্ত্ম) অভিযানের আয়োজন করেছিলাম। প্রবীণ অভিযাত্রী শ্রীশৈলেশ চক্রবর্তী এই অভিযানের নেতা ও প্রখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীঅমূল্য সেন অভিযানের সহ-নেতা নির্বাচিত হয়। দলের অন্যান্য সদস্যরা হল—সর্বশ্রী দাশরথি সরকার, কৃপাণ দাশগুপ্ত, জ্যোৎস্নাময় মুখোপাধ্যায় ও রেবা মুখোপাধ্যায়।

তারা ১২ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে রওনা হয়। ট্রেল্‌স পাস অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অভিযান।

১৭,৭০০ ফুট উঁচু ট্রেল্‌স পাস কুমায়ুন-হিমালয়ের একটি দুর্গম গিরিবর্ত্ম। ১৮৩০ সালে কুমায়ুনের দ্বিতীয় বৃটিশ ডেপুটি কমিশনার জি. ডবলু. ট্রেল প্রথম এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন বলে এর নাম ট্রেল্‌স পাস।

কাঠগুদাম ও আলমোড়া হয়ে অভিযাত্রীরা ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) পিথোরাগড় জেলার মহকুমা-সদর মুনসিয়ারী পৌঁছয়।

পরদিন মাত্র ৪ মাইল হেঁটে অভিযাত্রীরা পৌঁচেছিল লিলাম। ২২শে সেপ্টেম্বর খুব সকালে তারা লিলাম থেকে রওনা হল। পথ ভাল নয়। ডাইনে গৌরীগঙ্গা, বাঁয়ে পাহাড়—মাঝে মাঝেই ধস নামছে। পাহাড়টা যেন গৌরীগঙ্গার প্রেমে পড়েছে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাইছে তার বুকে। ভেঙ্গে পড়ার কোন সময়-অসময় ও নিয়ম-অনিয়ম নেই। ভালোবাসার কি সময় আছে, প্রেমের কি নিয়ম আছে?

অভিযাত্রীরা অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে এলো সেই ভয়ঙ্কর স্থান। অভিশপ্ত স্থানও বলা যেতে পারে। কারণ ফেরার পথে এই স্থান অতিক্রম করতে পারে নি অণিমাদি। চিরকালের মতই লিলাম রয়ে গেছে তার পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে।

৮,৬০০ ফুট উঁচু বুগডিয়ার গ্রামের স্কুলে তারা সে-রাতটি কাটিয়েছিল। পরদিন ন' মাইল হেঁটে পৌঁচেছিল মার্তোলী (১২,০২২´)। গ্রামটি ভারী সুন্দর—চারিদিকেই তুষারাবৃত শৈল-শিখর। গ্রামের উপকণ্ঠে লওয়ান নদী এসে মিশেছে পিথোরাগড় জেলার প্রাণধারা গৌরীগঙ্গার সঙ্গে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মার্তোলীতে অভিযাত্রীদের দু'টি দিন নষ্ট করতে হল। ২৭শে সেপ্টেম্বর সকালে তারা আবার রওনা হল ট্রেল্‌স পাস-য়ের পথে। পথ বলে কিছু নেই। ভেড়া চলাচলের দুর্গম পাকদাণ্ডি বেয়ে তারা ওপরে উঠতে থাকল। চার

মাইল এগিয়ে পৌঁছল প্রায় জনশূন্য লোকাঁ (১৩,৫০০´) গ্রামে। শীতের ভয়ে নিচে পালিয়ে যাবার সময় গ্রামবাসীরা সব আলু তুলে নিয়ে যেতে পারে নি। অণিমাদি ক্ষেতে নেমে মহানন্দে আলু তুলতে আরম্ভ করল।

মাইল দু'য়েক এগিয়ে প্রথম বরফ পাওয়া গেল। অণিমাদির আনন্দ আর ধরে না। শিশুর মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিল। বরফের বল বানিয়ে সকলের গায়ে ছুঁড়তে লাগল। তারপরে একসময় বসে পড়ল বরফের ওপরে। বটুয়া থেকে ডায়েরী ও পেন্‌সিল বের করে ছবি আঁকতে থাকল। বেশ ভাল ছবি আঁকত অণিমাদি।

২৮শে সেপ্টেম্বর সকালে রতগংগাল তাঁবু গুটিয়ে ওরা রওনা হল গিরিবর্ত্মের দিকে। সেদিন সন্ধ্যের একটু আগে তারা তাঁবু ফেলল ট্রেল্‌স পাস্‌-য়ের পাদদেশে ১৬,৩০০ ফুট উঁচু বিঠলগো-য়ারে। আর মাত্র চৌদ্দশ' ফুট। অভিযাত্রীরা সকলেই আনন্দিত। সাফল্য সুনিশ্চিত। কিন্তু অন্তর্যামী বোধ করি তখন নীরবে হাস-ছিলেন।

সেদিন শেষরাত থেকে শুরু হল তুষার ঝড়। পরদিনও চলল প্রকৃতির তাণ্ডব। কিন্তু শেষরাতের দিকে ঝড় কমে গেল। ভোরের আলো ফুটবার আগেই অভিযাত্রীরা বেরিয়ে পড়ল গিরি-বর্ত্মের দিকে।

কিছুক্ষণ চলার পরে ভোর হল—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ সাল। বরফের কাদা ভেঙ্গে এগিয়ে চলল তারা।

বেশি দূর এগোতে পারল না। আবার শুরু হল প্রবল তুষার-পাত, সেই সঙ্গে বাতাস। অণিমাদি বলল—প্রকৃতির কাছে এত সহজে হার মানব না আমরা। আমরা এগিয়ে যাব।

কিন্তু সেদিন শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল অণিমাদিকে—প্রকৃতির কাছে নয়, কুলিদের কাছে। তারা কিছুতেই আর এগিয়ে যেতে রাজি হল না। কারণ তাদের ধারণা কুমায়ুনের

পরমারাধ্যা নন্দাদেবী ক্রুদ্ধা হয়েছেন। আর এগোলে সবাইকে শেষ শয্যা পাততে হবে নন্দাদেবীর পদতলে।

অগত্যা গভীর দুঃখের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বিফল হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে আয়োজিত প্রথম ট্রেল্স পাস অভিযান। গৌরবের কথা ১৯৭২ সালে শ্রীপ্রদীপ্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কলকাতার হিমালয় লাভার্স এসোসিয়েশনের দু'জন সদস্য ট্রেল্স পাস-য়ের ওপরে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। আরও আনন্দের কথা ১৯৬৪ সালের সেই অভিশপ্ত অভিযানের নেতা শ্রীশৈলেশ চক্রবর্তী তাদের দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রদীপ্তকে ধন্যবাদ, সে অণিমাদির স্বপ্নকে সফল করে তুলেছে।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম—পরাজিত অভিযাত্রীরা ঝড়ের বেগে নেমে চলল নিচে। তারা ১লা অক্টোবর (১৯৬৪) ফিরে এলো মার্তোলী। পরদিন ২রা অক্টোবর পৌঁছতে চাইল লিলাম। দুপুরের পরে ফিরে এলো বুগ্ডিয়ার। কুলিরা সেদিন আগেই এসে রান্না-খাওয়া সেরে নিয়েছে। কৃপাণবাবু ও অণিমাদি এলো সবার আগে। তারা খেয়ে নিয়ে সহ-যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সবাই এসে পৌঁছলে অণিমাদি নেতাকে বলল—আমরা দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে আস্তে আস্তে আসুন। আমি লিলাম পৌঁছে রান্না করে রাখব।

কৃপাণবাবু ও অণিমাদি সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিল। বেলা ছটা নাগাদ তারা পৌঁছল সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটায়, যাবার সময় যেখানে ধস নামতে দেখে গেছে। কিন্তু জায়গাটা যেন সেদিন মরণ ফাঁদে রূপান্তরিত। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ক্রমাগত ধস নেমে পথরেখা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

জায়গাটার চেহারা দেখে ওরা থমকে দাঁড়ালো। একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। সমস্ত পাহাড়টাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়তে চাইছে গৌরীগঙ্গার বুকে। ওরা সাবধান হল।

কৃপাণবাবু ভাল করে দেখে নিলেন। নাঃ পাহাড়টা শান্ত ও

স্থির। কোথাও একটি নুড়ি পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। তাঁর মনে হল —এখন পার হওয়া যেতে পারে। তবে পাশাপাশি নয়, আগে ও পরে। অণিমাদি চলল আগে আগে, কৃপাণবাবু তাঁর পেছনে।

কতটুকুই বা জায়গা? পেরোতে বড় জোর মিনিট পনেরো লাগে। ওরা ধীর পদক্ষেপে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এলো। কৃপাণবাবু ঘড়ি দেখলেন—ছ'টা বেজে দশ। না, দিনের আলো থাকতেই লিলাম পৌঁছন যাবে। আর মাত্র মাইল দেড়েক। কিন্তু হিমালয়ের পথে মাইলের হিসেব অচল। লিলাম ছিল বহুদূর—অণিমাদির পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে।

সহসা একটা প্রচণ্ড গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠল চারিদিক। কৃপাণবাবুর মনে হ'ল সারা পৃথিবীটা দুলে উঠল। প্রকাণ্ড একখানা পাথর পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল অণিমাদির ওপরে। কোন শব্দ করতে পারার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল হিমালয়ের কোলে।

হিমালয় সস্নেহে তাকে বুকে তুলে নিল।

হিমালয়ের হাতছানি আর কোনদিন ব্যাকুল করে তুলবে না অণিমাদিকে। কখনও সে আর আকুল হয়ে হিমালয়ের পথে পথে ছুটে বেড়াবে না। হিমালয়ের সঙ্গে চিরমিলন হল অণিমাদির। হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে ম্যাডাম কোগানের নামের পাশে আর একটি নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হল—অণিমা সেন।

অণিমাদির পরে বাংলা হারিয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ চৌধুরীকে—আমাদের সোনার গৌরাঙ্গকে। তারও আদিনিবাস বরিশালে আর অণিমাদির মতো সে-ও পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। শৈশব থেকেই গৌরাঙ্গ ছিল দুঃসাহসী। দার্জিলিং থেকে বেসিক মাউণ্টে-নিয়ারিং ট্রেনিং নিয়ে এলো গৌরাঙ্গ। তারপরেই হিমালয়ের নেশা পেয়ে বসল তাকে। ১৯৬০ সালে গাড়োয়ালের সপ্তশৃঙ্গ

শিখরে ও নীলগিরি পর্বতে সে প্রায় বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেছিল। গৌরাঙ্গ পর্বতাভিযাত্রী সংঘ (কলকাতা) আয়োজিত প্রথম মানা (২৩,৮৬০´) অভিযানে অংশ নেয় এবং বাইশ হাজার ফুট পর্যন্ত ওঠে। সে এভারেষ্ট বিজয়ী শ্রীনওয়ং গম্বুর সঙ্গে বদ্রীনাথের নারায়ণ পর্বতে আরোহণ করে।

তারপরে বছর তিনেক চাকরি ও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল গৌরাঙ্গ। সে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস-ও করেছিল কিন্তু সুসংবাদটি শুনে যেতে পারে নি।

পরীক্ষার পরেই পুণার ডাক্তার জি. আর. পট্টবর্ধনের সঙ্গে গঙ্গোত্রী-১ (২১৮৯০´) শৃঙ্গারোহণের জন্য যাত্রা করে গৌরাঙ্গ।

এই অভিযানের খুব সামান্য সংবাদই জানা গেছে। যা জানা গেছে তাও গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হবার পরে। সে সময় তার সঙ্গে মিনজুর নামে একজন শেরপা ছিল। মিনজুরই সেই শোচনীয় ঘটনার একমাত্র সাক্ষী। সে বলেছে—অভিযানের তিন নম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছিল প্রায় উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে। অভিযানের সদস্য শ্রীপুরোহিত, মিনজুর এবং আরেকজন শেরপাকে নিয়ে গৌরাঙ্গ ৮ই জুন সেই শিবির প্রতিষ্ঠা করে।

১০ই জুন তার নিকটবর্তী রুদ্রগৌরী শৃঙ্গে (১৯,০৯০´) আরোহণ করল। তারপরে পুরোহিত নেমে গেল নিচের শিবিরে। শেরপাদের নিয়ে গৌরাঙ্গ রয়ে গেল সেখানে—গঙ্গোত্রী-১ শিখরের পথ তৈরি করতে।

সেই তুষারাবৃত অঞ্চলে একটানা সাতদিন প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে ১৮ই জুন বিকেলে গৌরাঙ্গ তুষারান্ধ হয়ে যায়। শেরপারা তাকে নিচে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু গৌরাঙ্গ রাজি হয় না।

শেরপারা নিচে নেমে যায়। তুষারান্ধ হয়েও সেই তুষারাবৃত শিবিরে একা পড়ে থাকে গৌরাঙ্গ। অথচ ডাক্তারীশাস্ত্র বলে, তুষারান্ধ কিম্বা তুষারক্ষত হলে তুষারাবৃত প্রান্তর থেকে নিচে নেমে যেতে হয়!

পরদিন মিনজুর নিচের শিবির থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরে আসে। দেখে, গৌরাঙ্গর চোখ অনেকটা ভাল হয়ে গেছে।

তার পরের দিন—২১শে সেপ্টেম্বর। সকালে ঘুম থেকে উঠেই গৌরাঙ্গ মিনজুরকে বলে—আমি ভাল হয়ে গেছি। চলো, আজ শিখরারোহণের চেষ্টা করা যাক্।

—সঙ্গে মাত্র দেড় শ' ফুট দড়ি আছে। এ নিয়ে দু'জনের পক্ষে শিখরে আরোহণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আপনি অসুস্থ। চলুন, আমরা নিচে চলে যাই।

—নো, নো, কাওয়ার্ড। গৌরাঙ্গ গর্জে ওঠে।—নেমে গেলে, প্রত্যেকে আমাদের কাপুরুষ বলবে। বলবে আমরা জনসাধারণের টাকা-পয়সা নিয়ে হিমালয়ে পিক্‌নিক্ করেছি। আমার চোখ এখন বেশ ভাল আছে। তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না। তবে দড়ির সমস্যাটা সত্যই ভাববার মতো। আচ্ছা, তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা করো। আমি একবার সেই বিপজ্জনক জায়গাটার ছবি নিয়ে আসি। দেখে আসি, কমপক্ষে কতটা দড়ি দরকার এবং শিখরের অন্য কোন পথ আছে কিনা? আমি আধঘণ্টার ভেতরে ফিরে আসছি।

সে আধঘণ্টা আজও অতিক্রান্ত হয় নি। কাঁধে ক্যামেরা ও হাতে আইস-এক্স নিয়ে গৌরাঙ্গ সেই যে বেরিয়ে গেছে, আর সে ফিরে আসে নি শিবিরে। আর্ভিন ও ম্যালোরীর মতো গৌরাঙ্গ চৌধুরীও হারিয়ে গেছে হিমালয়ে। তবে তাঁদের মতই গৌরাঙ্গকেও চিরকাল পাওয়া যাবে খুঁজে পর্বতারোহণের ইতিহাসে এবং দুঃসাহসী ভারতীয় তরুণদের তালিকায়।

গৌরাঙ্গর পরে অমর—অমর রায়। তার পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলার বিনোদপুর গ্রামে। অণিমাদি ও গৌরাঙ্গর মতো সে-ও পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

লেখা-পড়ায় অমর মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু খেলা-ধূলা ও নৌকা বাওয়ায় সর্বদাই সে ছিল সবার সেরা। ১৯৫৬ সালে আই. কম্. পাশ করে সে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি নেয়। প্রাইভেটে বি. কম. পাশ করে আইন পড়তে থাকে।

অমর ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের একজন প্রথম সারির সদস্য। সেই রোয়িং ক্লাবে বসেই একদিন পর্বতারোহী অমূল্য সেনের সঙ্গে অমরের পরিচয় হয়। অমূল্যর কাছ থেকে গল্প শুনে সে পর্বতারোহণে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং দার্জিলিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়ে আসে।

তারপরেই অমর শ্রীসুজিত বসুর ( ) চতুরঙ্গী অভিযানে যোগদান করে। খবরে প্রকাশ—চতুরঙ্গী অভিযানের অভিযাত্রীরা ১০ই অক্টোবর মূল-শিবির স্থাপিত করে। তারা প্রথমে সতপন্থ (২৩,২১৩´) শিখরে আরোহণের চেষ্টা করে। কিন্তু আবহাওয়ার জন্য তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ফেরার পথে তারা ভাগীরথী-২ (২১,৩৬৪´) শিখরে আরোহণ করতে চায়। ২২শে অক্টোবর সকালে অমর সহযাত্রী গোবিন্দরাজ, শেরপা গিয়ালবু ও কারমাকে নিয়ে শেষ শিবির থেকে শিখরাভিযান শুরু করে। বিকেল পাঁচটার সময় তারা শিখরে উপস্থিত হয়।

আধঘণ্টা শিখরে অতিবাহিত করে অভিযাত্রীরা অবরোহণ আরম্ভ করে। পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে তাঁরা সাবধানে নামতে থাকে। একই দড়ি চারজনের কোমরে বাঁধা। প্রথমে গিয়ালবু, তারপরে অমর ও গোবিন্দরাজ। সবার শেষে কারমা। সহসা কারমার পা ফসকায়। পেছনের আকস্মিক টানে সামনের অভিযাত্রীরা বে-সামাল হয়ে যায়। কঠিন ও খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে তারা গড়িয়ে পড়ে নিচে—প্রায় তিন হাজার ফুট নিচে একটা গভীর খাদের ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয় অমর। তারপরে গিয়ালবু। পরদিন কারমা। সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েও গোবিন্দরাজ আশ্চর্যজনক

ভাবে বেঁচে যায়। গোবিন্দরাজ দুর্গম ভাগীরথী অভিযানের একমাত্র সাক্ষী। তার সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য জীবন দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাই।

চৌষট্টিতে অণিমাদি, পঁয়ষট্টিতে গৌরাঙ্গ, ছেষট্টিতে অমর। পরপর তিন বছর আমরা হিমালয়ে তিনটি অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিলাম। তারপরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। পরবর্তী তিন বছরে প্রচুর পদযাত্রা ও পর্বতাভিযান পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু ভাগ্যদেবী বোধকরি তখন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন।

সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃতীয় মহিলা অভিযান আয়োজিত হল। এই অভিযানের নেতৃত্ব করে শ্রীমতী সুজয়া গুহ। ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল স্বনামধন্য সুলেখক এবং সুবিখ্যাত হিমালয়-প্রেমিক শ্রীকমল কুমার গুহের সুযোগ্যা সহধর্মিনী।

দলের অন্যান্য সদস্যরা হল—সুদীপ্তা সেনগুপ্তা, কমলা সাহা, নীলু ঘোষ, শেফালী চক্রবর্তী ও ডাক্তার পূর্ণিমা শর্মা। এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 'অল্ লেডিজ এক্সপিডিশান।' ডাক্তার ছাড়া অভিযানের অন্যান্য সদস্যরা সকলেই দার্জিলিং কিংবা উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পর্বতারোহণ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। সুজয়া, সুদীপ্তা ও কমলা দু'জায়গা থেকেই এ্যাড্ভান্স ট্রেনিং নিয়েছিল।

লেখাপড়ায়ও তারা প্রত্যেকেই ভাল ছিল। সুজয়া, সুদীপ্তা ও নীলু তার আগেই এম. এ. অথবা এম. এস. সি. পাস করেছে। কমলা তখন এম. এ. পড়ছিল।

সুদীপ্তা ও সুজয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা অভিযানের

সদস্যা ছিল। এছাড়া সুজয়া মণিমহেশ, অমরনাথ ও রূপকুণ্ডে গিয়েছিল, অতিক্রম করেছিল কুয়ারী গিরিবর্ত্ম। সে ছিল দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্যা।

সালের সেই অভিযানটি হল—মহিলা লাহুল অভিযান।
লাহুল-স্পিতি হিমাচল প্রদেশের একটি জেলা। সেই জেলার বড়া-শিগ্‌রী হিমবাহ অঞ্চলের ২০,১৩০ ফুট উঁচু একটি নামহীন অপরাজিত শৃঙ্গ আরোহণ করতে চেয়েছিল তারা। ঠিক করেছিল অভিযান সফল হলে সেই শৃঙ্গটির নাম রাখবে 'ললনা'।

তাদের সে বাসনা অপূর্ণ থাকে নি। কলকাতা থেকে রওনা হবার আঠাশ দিন পরে, ২১শে আগস্ট (   ) তারিখে সুজয়া, সুদীপ্তা ও কমলা সেই নামহীন শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হল। তারা শৃঙ্গটির নাম রাখল 'ললনা'। বঙ্গললনারা লাহুল-ললনাকে প্রণাম করল। তারপরে তার শীর্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা এবং ওদের সংস্থা 'পথিকৃৎ'-এর পতাকা প্রোথিত করল। তিব্বতী ওড়না চকোলেট ও ফলের রস দিয়ে শিখরপূজা সমাধা করল।

শিখরবিজয়িনীরা ২৩শে আগস্ট ফিরে এলো মূল-শিবিরে। মিলিত হল নীলু শেফালী ও পূর্ণিমার সঙ্গে। ওদের মিলনানন্দে মুখরিত হল বড়া-শিগরী হিমবাহ। তারুণ্যের জয়গানে উদ্বেলিত হল লাহুল হিমালয়—সুজয়ার পরমপ্রিয় লীলাভূমি-লাহুল।

পর্বতারোহণ শেষ হলেও পর্বতাভিযান শেষ হয় নি তখনও। পর্বতাভিযান শেষ হয় অভিযাত্রীরা ঘরে ফিরে আসার পরে। তার তখনও অনেক বাকি।

পনেরোটি ঘোড়া ওদের সাজ-সরঞ্জাম মূল-শিবিরে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছিল। কাজেই কয়েকটি ঘোড়া না হলে ওরা মূল-শিবির ছাড়তে পারছিল না। পরদিন দু'জন কুলিকে সুজয়া বাতাল পাঠিয়ে দিল। বাতাল লাহুল-স্পিতি পথে ওপরে অবস্থিত একটি অস্থায়ী উপনিবেশ। সেখানে ঘোড়া পাওয়া যায়।

দু'টি দিন চলে গেল। কিন্তু কুলিরা ফিরে এলো না। তাই ২৬শে আগস্ট (   ) সকালে শেফালী ও কমলাকে নিয়ে সুজয়া রওনা হল বাতালের পথে। দু'জন কুলিকে সঙ্গে নিল সুজয়া।

মূল-শিবির থেকে বাতালের দূরত্ব আট মাইলের মতো।

সাত মাইল গিয়ে করচা নালা। করচা একটি পাহাড়ী নদী। বাতাল যেতে হলে করচা পেরোতেই হবে। সকাল ন'টার মূল-শিবির থেকে রওনা হয়ে বেলা বারোটা নাগাদ সেদিন সুজয়ারা করচার তীরে পৌঁছল। করচায় তখন কোমর সমান জল। সে দুর্দাম ও দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে। কুলিরা তাদের করচা পেরোতে নিষেধ করল। অথচ সেখান থেকে বাতালকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাত্র মাইল খানেক পথ। সেখানে পৌঁছতে পারলে ওরা অনেক-দিন বাদে মানুষ দেখতে পাবে, ঘোড়া যোগাড় করা যাবে, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে পারবে।

কুলিরা অতিকষ্টে করচা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। সুজয়া তাদের তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলে দিল। ওরা বসে রইল করচার তীরে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কুলিদের দেখা নাই। কি জানি কি মতলব? আগের কুলিদের মতো এরাও হয়তো বে-পাত্তা হয়ে যাবে। ইচ্ছে করেই ওরা এমন করে। যত দেরি করতে পারবে, তত বেশি রোজগার হবে যে।

সুতরাং শেফালী ও কমলার সঙ্গে আলোচনা করে সুজয়া সাব্যস্ত করে কুলিদের ভরসায় আর বসে থাকা সমীচীন নয়। একবার বাতাল যাওয়া দরকার। ভয় পাবার কি আছে? ওরা বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু ললনা শিখরে আরোহণ করতে পারল আর এই বিশ ফুট চওড়া নালাটা পেরোতে পারবে না?

হাত ধরা-ধরি করে ওরা তিনজনে উচ্ছ্বসিত করচার হিমশীতল জলে নেমে পড়ে। প্রথমে সুজয়া, তারপরে কমলা, সবার শেষে শেফালী—তার হাতে আইস-এ্যাক্স। ওরা শক্ত হাতে একে অপরকে ধরে, খুব সাবধানে এক-পা এক-পা করে এগোতে থাকল। প্রায় অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এলো।

এমন সময় হঠাৎ শেফালীর আইস-এ্যাক্সটা জলে পড়ে গেল। সে নিচু হয়ে ধরতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কমলার হাত থেকে তার

হাতটা খুলে এলো। সে কাত হয়ে জলে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তুষারশীতল জলধারা তাকে দুর্বার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। শেফালী শুধু দেখতে পেলো, সুজয়া ও কমলা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। শুনতে পেলো সুজয়া চীৎকার করে বলছে—আইস এ্যাক্স,····· আইস এ্যাক্স।

সুজয়া সেদিন কি বলতে চেয়েছিল শেফালী আজও জানে না। কারণ আর কিছু শুনতে পায় নি সে। কেউ কোনদিন সুজয়ার কথা আর শুনতে পাবে না এ জগতে।

শেফালী শুধু বলেছে, জ্ঞান ফিরে আসার পরে সে দেখতে পেলো নালার তীরে বড় একখানা পাথরের পাশে কোনমতে তার দেহটা আটকে রয়েছে। খুব সহজেই সে তীরে উঠে এলো।

কিন্তু কোথায় ওরা? সুজয়া ও কমলা? যেখানে জলে পড়ে গিয়েছিল, সে ছুটে এলো সেখানে। শীতে তখন তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে। গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। তবু শেফালী চিৎকার করে উঠল—সুজয়াদি······কমলা·········

কেউ সাড়া দিল না। শুধু শেফালীর আকুল আহ্বান বড়াশিগ্রি গ্লেসিয়ারের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে শেফালীর কাছেই ফিরে ফিরে এলো।

কমলাকে আর পাওয়া যায় নি খুঁজে; কিন্তু সুজয়াকে পাওয়া গিয়েছিল কিছুক্ষণ পরে—করচা নালারই জলে, তেমনি একখানি পাথরের পাশে। তবে শেফালীর মতো সে আর উঠে আসতে পারে নি তীরে।

কুলিরা তাকে ওপরে তুলে এনেছে। সুজয়া অনেক আগেই তার সাধের হিমালয়ের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। ৩০শে আগষ্ট লাহুলের জেলাসদর কেলং-য়ের কাছে ইস্তিংরীর মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

সুজয়া ও কমলা আর ফিরে আসে নি আমাদের মাঝে। তবু বলব ওরা আজও আছে বেঁচে। অনিমাদি, গৌরাঙ্গ এবং অমরের

মতো সুজয়া আর কমলাও বেঁচে রয়েছে হিমালয়ের জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে।

ওদের অমর আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই জাপানী পর্বতারোহিণী জাঙ্কো তাবেই-কে এভারেষ্ট আরোহণের প্রেরণা যুগিয়েছে। মিসেস তাবেই বিগত ১৬ই মে (   ) শেরপা আঙ গেরিং-য়ের সঙ্গে বিশ্বের উচ্চতম স্থানে পদার্পণ করে শুধু আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষকেই সার্থক করেন নি, সুজয়াদের স্বপ্নকেও সফল করে তুলেছেন।

ওরা বেঁচে থাকবে চিরকাল। বেঁচে থাকবে তাদের এই প্রিয় পৃথিবীর শত-সহস্র মানুষের অন্তরে—দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। আমার এবং আমার পাঠক-পাঠিকার বুকের মাঝে।

: সম্প্রতি প্রকাশিত লেখকের কয়েকখানি বই :

রাজভূমি-রাজস্থান : লীলাভূমি-লাহুল : গঙ্গা-যমুনার দেশে : ভাঙা দেউলের দেবতা : তমসার তীরে তীরে : বৈশাখী পূর্ণিমা : উত্তরস্যাং দিশি : চরণ : রেখা : গঙ্গাসাগর-মধু-বৃন্দাবনে

(ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবন পর্ব)

: বিষয় সূচী :